

তুঙ্গভদ্রা

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী

বেঙ্গল পবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬৯

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রক—মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১ দীনবন্ধু লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

কানাই পাল

চার টাকা

উৎসর্গ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

[illegible]

তুঙ্গভদ্রার তীরে সভ্যতার বিকাশ হয়েছে যুগে যুগে—রামায়ণের যুগে কিষ্কিন্ধ্যা, বিগত যুগে বিজয়নগর, আজকের যন্ত্রের যুগে তুঙ্গভদ্রা বাঁধা পড়েছে। এ কাহিনীর কতটা ইতিহাস আর কতটা কল্পনা, সুধী পাঠক তা সহজেই বুঝবেন।

এই লেখকের লেখা

রূপম্ ?

একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

অগ্নি অবন্ধনে

জনম জনম

কী মায়া

আরও আলো

রম্যাণি বীক্ষ্য :

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব

২. দ্রাবীড় পর্ব

৩. কালিন্দী পর্ব

৪. রাজস্থান পর্ব

৫. সৌরাষ্ট্র পর্ব

॥ এক ॥

সায়াহ্নের সূর্য-কিরণ তখন প্রাসাদ-চূড়া স্পর্শ করেছে। শীত-শেষের তুঙ্গভদ্রার শীর্ণ স্রোত নিস্তরঙ্গ। তার উপর আরক্ত পশ্চিমাকাশের প্রতিবিম্ব পড়েছে দর্পণের মতো। নদীতটে শ্যামল তৃণাস্তরণে বসে প্রকৃতির এই রূপ পরিবর্তন দেখছিলেম। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুখে এল :

রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।

রাজকুমার ভাস্কর দেব আমার পাশে শুয়েছিলেন। অকস্মাৎ তড়িতাহতের মতো চমকিত হয়ে উঠে বসলেন। বললেন : আজ তোমার এ কথা কেন মনে এল ব্রাহ্মণ ?

কেন মনে এল জানি না। কী উত্তর দেব প্রশ্নের !

এক খণ্ড শিলা সংগ্রহ করে সেটা নিক্ষেপ করলেম শান্ত সলিলের উপর। সেই শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত করল চারিপাশের জলরাশি। বলয়ের মতো তরঙ্গ বিক্ষোভ হল। তারপর আবার সব শান্ত। বললেম : কী দেখলে রাজকুমার ?

ভাস্কর বললেন : ঐ তরঙ্গ-ভঙ্গ বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেল।

বললেম : তুঙ্গভদ্রাকে যদি কালস্রোত বল, তাহলে বিজয়নগর ঐ শিলাখণ্ড। দুশো উনত্রিশ বছর আগে যে আলোড়ন জেগেছিল এখানে, আজ তার দম ফুরিয়ে গেছে। রঘুপতির অযোধ্যা আজ নেই। বিজয়নগরও এক দিন থাকবে না।

ভাস্কর আবার সেই প্রশ্ন করলেন : কিন্তু আজ এ কথা কেন ?

বললেম : আজই তো এই কথা ভাববার সময় রাজকুমার। দূত মুখে তালিকোটের প্রান্তরে শত্রু সৈন্য সমাবেশের সংবাদ কি পাও নি?

ভাস্কর বললেন : যোগ্য সেনাপতির নেতৃত্বে বিজয়নগরের সৈন্যদলও তো এগিয়ে গেছে।

বললেম : তা গেছে। কিন্তু শত্রু কেন থাকবে? কিসের জন্য বিবাদ?

ভাস্কর বললেন : শক্তি থাকলে বিবাদ, আর রাজ্য থাকলে শত্রু। বিবাদ আর শত্রু আছে বলেই ক্ষত্রিয় আছে। জগৎ নির্বিবাদ হলে আমরাও ব্রাহ্মণ হয়ে তোমাদের মতো শাস্ত্রাধ্যয়ন করব।

বললেম : তা হলে ক্ষত্রিয় রক্ষার জন্যই শত্রু সৃষ্টি তোমরা কর?

ভাস্কর যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন। বললেন : কথাটা উল্টো হল। ক্ষত্রিয় রক্ষার জন্য শত্রু নয়, শত্রু আছে বলেই ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন।

আমি আমার পুরাতন প্রশ্নে ফিরে গেলেম। বললেম : আমার প্রশ্ন তো এইটেই। শত্রু কেন থাকবে?

ভাস্করের সংস্কারে ও শিক্ষায় আছে এ প্রশ্নের ভ্রান্ত উত্তর। সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন : রাজ্য থাকলেই শত্রু।

বললেম : জীবনের মতো মৃত্যুকেও মানি। তাতে মানুষের হাত নেই। কিন্তু শত্রু মানুষের দেওয়া সংজ্ঞা। নিজের আচরণে মানুষ মানুষকে শত্রু কিংবা মিত্র করে। কিন্তু শত্রু মিত্র ছাড়াও যে অসংখ্য মানুষ আছে জগতে, তারা শত্রু নয় মিত্রও নয়। সেই নিরপেক্ষ সম্বন্ধ রক্ষা কি আজ সম্ভব নয়?

ভাস্কর বললেন : মানুষ স্বার্থপর। স্বার্থপরতা শত্রুর জন্মদাতা। মানুষে মানুষে বিবাদ তাই অবশ্যম্ভাবী।

বললেম : ভুলে যাচ্ছ, ভারতের আদর্শ ত্যাগ। স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভারতবাসীর আদর্শ নয়।

এ কথার জবাব ছিল না ভাস্করের ভাণ্ডারে।

বললেম : এ দেশে পর্তুগীজ বণিক এসেছে সাতষট্টি বছর আগে। আর ভারতের মাটিতে পা দিয়েই বিবাদ বাধিয়েছে কালিকটের রাজা জামোরিন আর আরবী বণিকদের সঙ্গে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ইংরেজ আর ওলন্দাজরা ভারতের পথ খুঁজছে। এই বিদেশীরা সবাই আসছে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে। ভারতে গৃহবিবাদ বাধানো হবে এদের স্বার্থ। এরা সোনা দানার পরিবর্তে গোলা বারুদ দেবে। ধর্ম নিয়ে মন্ত্রণা দেবে, আর সিঁদ কাটবে রাজদণ্ডের লোভে। দেশে আমরা নিজেরা শত্রু পরিবৃত হয়ে থাকলে বিদেশী শত্রু রোধ করব কোন্ শক্তি দিয়ে ?

ভাস্কর তার বিস্মিত দৃষ্টি তুলে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন : তোমার বয়স কত মাধব ?

বললেম : ও নামে আমাকে ডেকো না রাজকুমার। ও নাম বহন করবার যোগ্যতা আমার নেই।

জন্ম সময়ে অনেক আশায় পিতা এই দেবনাম দিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু নাম মানুষকে যোগ্য করে না। মনে পড়ল বেদের ভাষ্যকার মহাপুরুষ সায়নের কথা। এ নাম সার্থক করেছিলেন তাঁর ভ্রাতা মাধব বিদ্যারণ্য। আমি তাঁর গল্প শোনালেম ভাস্করকে : প্রায় আড়াইশো বছর আগে মাধব বিদ্যারণ্য আমাদের শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য ছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠ বললে সবটুকু বলা হয় না। শঙ্করাচার্য ভারতে শুধু চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, উত্তরে হিমালয়ে বদরিনারায়ণের পথে জ্যোর্তিমঠ বা যোশীমঠ, আর দক্ষিণে তুঙ্গা নদী তীরে শৃঙ্গগিরি বা সিংহারী মঠ, আমরা সংক্ষেপে বলি শৃঙ্গেরী মঠ। তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীর সঙ্গম স্থান কুদালী, এই মঠ তার আরও উজানে। এক সময় মণ্ডন মিশ্র ছিলেন মগধ রাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। শঙ্করাচার্য প্রয়াগে তাঁকে বিচারে পরাস্ত করেন। এই মণ্ডন মিশ্রই পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শৃঙ্গেরী মঠের প্রথম অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন সুরেশ্বরাচার্য

নামে। শৃঙ্গেরীর ঐতিহ্য আজ আটশো বছরের। এমন একটি মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছি, ভাবতেও বুক ভরে ওঠে। বিজয়নগরকে লালন করেন মাধব বিদ্যারণ্য। এঁরই মন্ত্রণায় সঙ্গম পুত্রেরা সামান্য একখানি গ্রাম থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করেছেন। নগরের বিজয়নগর নাম তো নূতন। প্রথম রাজা হরিহর কৃতজ্ঞ চিত্তে এর নাম রেখেছিলেন বিদ্যানগর।

ভাস্কর বললেন: কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তো পেলেম না।

বললেম: আসলে আমার কথায় বার্ধক্যের ছাপ দেখেই এই প্রশ্ন তোমার মনে জাগছে, তাই নয়? কিন্তু এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের ভারে নয়। ভূর্জ পাতায় যে জ্ঞান ধরা আছে ভারতের ঋষি আর মনীষিদের, সেই জ্ঞানের খানিকটা আস্বাদেই যৌবনটা হারিয়েছি। বয়স আমার তোমারই মতো, হয়তো কিছু বেশি। ত্রিশ এখনো পার হয় নি।

কত দিন আছ এ রাজ্যে?

শুধোলেন ভাস্কর।

বললেম: বেশি দিন নয়, তোমারই মতো প্রবাসী আমি। রাজকন্যা গায়ত্রীর শিক্ষার জন্য মহারাজা সদাশিব রায় দূত প্রেরণ করেছিলেন আমার অধ্যক্ষের কাছে। মাসাধিক কাল হল আমি সেই ভার নিয়ে এখানে এসেছি। নিজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেওয়াকে তুমি ভার বলবে না রাজকুমার?

বড় বিমর্ষ দেখাল ভাস্করকে। বললেন: বারে বারে তুমি আমায় রাজকুমার বলে সম্বোধন করছ। আমি কী ভাবছি জান? বোধ হয় আমাকে উপহাস করছ। আজ প্রায় আড়াইশো বছর আমরা রাজ্যহীন। আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর আমাদের রাজ্যহীন করেছে। আজ রাজকুমার বলে বারে বারে আমার অক্ষমতার খোঁটা দিও না মাধব।

বললেম: ও নাম তো তোমার যাবে না বন্ধু। জন্মগুণে আজ

আমার ব্রাহ্মণ নাম। তেমনি রাজকুলে তোমার জন্ম, রাজকুমার নাম তো তোমার কপালে লেখা।

তুঙ্গভদ্রার জলের উপর প্রকৃতির প্রসাধন দেখছি দুজনে। রঙের কী নির্দয় অপচয়!

এক সময় ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: জন্মভূমির কথা তোমার মনে পড়ে?

বললেম: দেবগিরির কথা?

ভাস্কর বললেন: না দৌলতাবাদ। দেবগিরি নাম আমরা ভুলে গেছি।

বললেম: ভুলে যাবার মতো যথেষ্ট সময় হয়েছে সত্য, কিন্তু ও নাম তোমার রাজকুমার নামের মতো যে লেখা আছে আমাদের বুকে। ওই গিরি, ওই দুর্গ, ওই পথঘাট, সরোবর মন্দির, ওর সঙ্গে যে আমাদের নাড়ির যোগ। ওকে দেবগিরি না বলে দৌলতাবাদ বলতে কিছুতেই আমি পারব না। দৌলতকে শ্রদ্ধা করতে শিখি নি, দেবতাকে রেখেছি বুকের ভিতর।

ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: চাঁদ মিনারের কথা তোমার মনে আছে? বাহিরের সেই হাল্‌কা নীল রঙের বেড় দেখে তোমার আশ্চর্য লাগত। ভাবতে, এ কোন পাথর যার রং এমন আশমানী নীল। কে একজন তোমাকে বলেছিল, এগুলো পারস্যের টালি, মুসলমানেরা পারস্য থেকে এগুলো বয়ে এনেছে। সেই নীল রং আজও তেমনি সজীব আছে। মনে হবে, দু বছর আগে তৈরি হয়েছে এই চাঁদ মিনার, লোকে ভুল করে এর বয়স বলে দুশো বছর।

বললেম: চাঁদ মিনার আর আমার ভাল লাগে না। ওতে ফুলের সৌরভ নেই।

ভাস্কর বললেন: সে কি, মিনারে আবার সৌরভ কিসের?

বললেম: কেন, মন্দিরে আছে। এই বিজয়নগরেও আমি সৌরভ পাই সভ্যতার।

ভাস্করের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দিগন্তের দিকে। যেন একটু অন্যমনস্কও হয়েছেন। প্রশ্ন করলেম : কী ভাবছ?

উত্তর পেলেম না ভাস্করের।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সেই প্রশ্ন করলেম।

ভাস্কর এবারে চমকে জেগে উঠলেন। বললেন : একটি অলিন্দের কথা। কী সুন্দর কারুকার্য সেই অলিন্দের।

বললেম : এখনও তুমি অলিন্দের শোভা ভাবছ? রাজপ্রাসাদে অমন অলিন্দ আছে সহস্রাধিক।

তুঙ্গভদ্রার বক্ষে তখন অন্ধকারের ছায়া পড়েছে দীর্ঘ হয়ে। স্থানে স্থানে রক্তের আভা চাপ বেঁধে আছে। সে দিক থেকে আমি আমার দৃষ্টি ফেরাবার প্রয়োজন বোধ করলেম না।

অভিভূত ভাবে ভাস্কর প্রশ্ন করলেন : ওটি কার অলিন্দ মাধব?

বললেম : অমন কঠিন প্রশ্ন ক'রো না রাজকুমার! এত বড় প্রাসাদকে জানবার জন্য এক মাস সময় তো যথেষ্ট নয়। তার চেয়ে তুমি নিজের কথা বল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছ। দেহের ক্লান্তি বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নি, তাই না?

ভাস্করের জবাবটা কেমন এলোমেলো লাগল। বললেন : ক্ষুধা তৃষ্ণার মতো ক্লান্তিও একটা জৈব বোধ। পরিশ্রম না থাকলেও ক্লান্তি আছে।

বললেম : এত পরিশ্রম করে এখানে আসবার কারণ তুমি এখনও ব্যক্ত কর নি। এ প্রশ্নটা সৌজন্য বর্জিত হলেও প্রয়োজন বর্জিত নয়।

ভাস্কর তাঁর অপরাধ স্বীকার করে দুঃখিত হলেন, বললেন : সে কথা জানাতে আমি ভুলেই গিয়েছিলেম।

একটু ভেবে বললেন : তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তুমি এখানে এসেছ জেনে তোমার কাছেই এসেছি একটু আশ্রয়ের জন্য। দৌলতাবাদ আজ আর নিরাপদ নয়।

একটু থেমে বললেন : ভাবলেম—

আবার অন্যমনস্ক হলেন ভাস্কর।

জিজ্ঞাসা করলেম : কী ভাবলে ?

ভাস্করের উত্তর নেই।

চকিতে ফিরে দেখলেম, তাঁর দৃষ্টি আবার যেন হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হল, অলিন্দ নয়, ভাস্কর ভাবছেন অলিন্দের অধিকারিণী কন্যার কথা। ছায়ান্ধকারে যাকে দেখতে পেয়েছি, সে বুঝি আমারই শিষ্যা গায়ত্রী। তাঁর প্রসাধন সমাপ্ত করে এখন প্রকৃতির বেশ পরিবর্তনের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

আকাশে তারা উঠছে একটা দুটো করে। আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো নক্ষত্রের সভা বসবে চাঁদের সিংহাসন ঘিরে। ভাস্করের হাত ধরে আমি উঠে দাঁড়ালেম। বললেম : চল, বিঠল স্বামীর মন্দিরে বোধ হয় আরতির সময় হয়েছে।

॥ দুই ॥

বিঠল দেবের মন্দির থেকে তখন শঙ্খধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। সেই ধ্বনি আসছে পম্পাপতির মন্দির থেকে, আসছে চক্রতীর্থ থেকে। মতঙ্গ পর্বতের উপর পরশুরামের মন্দিরেও আরতি শুরু হয়েছে। শুষিরে শ্রীরাগের আলাপ হচ্ছে হাজরা রামস্বামীর মন্দিরে। সঙ্গতের শব্দ উঠছে আনন্ধে। ধূনক ও গুগগুলের সৌরভে আমোদিত রাজপথ। ধূপে ও ধূমে ভারাক্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত হাজরা রামস্বামীর মন্দির আমরা অতিক্রম করে এলেম। ভাস্করের মন তা অতিক্রম করে নি। ভাস্কর বললেন: আরাধনার রীতিতে কিছু পার্থক্য দেখছি যেন। এ মন্দির কি সাধারণের জন্য নয়?

বললেম: প্রাসাদ সংলগ্ন এ মন্দির রাজ পরিবারের উপাসনার জন্য। ব্রাহ্মণের গৃহে যেমন তাঁর নারায়ণ শিলা প্রাত্যহিক পূজার্চনার জন্য প্রতিষ্ঠিত, তেমনি রাজ-পুরনারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই রাম স্বামীর মন্দির। মহারাজা সদাশিব রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করেন।

ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: এ মন্দির দর্শনের অধিকার নেই আমাদের?

বললেম: গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ যেমন তার অনুমতি সাপেক্ষ, এখানেও সেই অনুমতির প্রয়োজন। মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি তার ব্যবস্থা করব। সত্যিই এ মন্দির দেখবার মতো। এমন কান্তিমান বিগ্রহ কম দেখেছি। এই দেবালয় প্রাঙ্গণে আর

একটি ছোট মন্দির আছে। সেটি লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। বিজয়নগর লক্ষ্মীর নগর, এর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পদচারণা।

জিজ্ঞাসা করলেম: তুমি রামায়ণ পাঠ করেছ ভাস্কর? না করে থাকলে এই রাম স্বামীর মন্দিরটি অবশ্য দেখো। এর প্রাচীর ও স্তম্ভ গাত্রে সমস্ত রামায়ণখানা চিত্রিত হয়ে আছে। নির্জীব শ্লোকে নয়, প্রাণবন্ত চিত্রে। বাল্মীকির শ্লোকে প্রাণ সঞ্চার করেছে বিজয়নগরের স্থপতি। রামের হরধনুর্ভঙ্গে রামের মুখে যে দীপ্তি দেখবে, সেই বলিষ্ঠ ইঙ্গিত আজকের ক্ষত্রিয়কেও প্রেরণা যোগাবে। এমন অপূর্ব কলা বুঝি বিজয়নগরেই সম্ভব।

ভাস্কর অন্য প্রশ্ন করলেন: মন্দির প্রাঙ্গণে আমাদের উপস্থিতি ব্যাঘাত ঘটাবে না তো রাজ-পুরনারীদের পূজার্চনায়?

বললেম: তার জন্য ভাবনা কী, আমরা সময়ান্তরে যাব।

এ যুক্তি যে ভাস্করের মনঃপূত হল না, তা তার উত্তর শুনেই বুঝতে পারি। বললেন: পূজার সময়ই দেবদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়। তাঁদের বিঘ্ন না হলে আমরা দূর থেকেই দর্শন করব।

দেবতার পূজার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। দেবতা কোন রীতি বা পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করে দেন নি। যা কিছু বিধি নিষেধ আমরা মানি, তা আমাদেরই নির্দেশ। দেবতার দর্শন যে একান্তেও হতে পারে, সে কথা ভাস্করকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারলেম না। বললেম: সেই ব্যবস্থারই চেষ্টা করব।

ভাস্কর যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন।

আমি বললেম: নগরবাসী এখন আর ঘরের কোণে কেউ বসে নেই। সারা দিন তারা নানা পরিশ্রম করেছে। এই আরতি ঘণ্টার শব্দ তাদের আনন্দে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ। আজ রাজপথে জনস্রোত নেই বলে তোমাকে এ কথা মুখে জানাতে হল।

ভাস্কর একটু ভেবে বললেন: তারা সবাই বুঝি যুদ্ধে গেছে?

বললেম : হ্যাঁ। বিজয়নগর আজ ক্ষত্রিয় শূন্য। শূদ্ররাও গেছে তাদের পরিচর্যায়। আর লক্ষ লক্ষ সেনা হস্তী ও অশ্বকে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে গেছে বৈশ্যরাও।

পথ চলতে চলতে আমি এদের যুদ্ধ যাত্রার গল্প বললেম : মহারাজ সদাশিব রায় সদাশিবই বটে। তাঁর রাজ-কার্য দেখে আমার বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্বাণ শব্দের কথা মনে হয়েছে। ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসের রাজা মিলিন্দকে বলেছিলেন, রাজ্য পরিচালনাকে যদি দুঃখবাদ বল তো নির্বাণ হল রাজ্য সুখ। মনে হল, মহারাজ সদাশিব নির্বাণ প্রাপ্তির মতো শুধু রাজ্যসুখটুকু উপভোগ করছেন। আর রাজ কার্য পরিচালনা করছেন তাঁর মন্ত্রী রামরাজা। রামরাজার কূটনীতির গল্প আর একদিন বলব। এ তার সময় নয়। আমি বলছিলেম এদের যুদ্ধ যাত্রার কথা। কিছু দিন আগে যখন দূত খবর নিয়ে এল যে তালিকোটের প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে, গোলকুণ্ডা বিদর আহমদনগর ও বিজাপুরের সুলতানেরা তাদের অতীতের সমস্ত বৈরিতা ভুলে যুক্ত ভাবে এই হিন্দুরাজ্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেছে, তখন আপন শক্তি-গৌরবে রামরাজা এ কথা বিশ্বাস করেন নি। যখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, তখন তার কঠোর ব্যবস্থা করতেও বিলম্ব করলেন না। ভ্রাতা তিম্নরাজাকে পাঠালেন এক লক্ষ পদাতিক বিশ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ শত হাতীর নেতৃত্ব দিয়ে। আর এক দিন এমনি একটি বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভেঙ্কটাদ্রি রওয়ানা হলেন। সকলের শেষে গেলেন রামরাজা নিজে। রাজ্যের অবশিষ্ট সেনাকে নিয়ে যেদিন তিনি জয়যাত্রা করলেন, মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণ শিবিকার ভিতর তাঁকে অশীতিপর বৃদ্ধ মনে হল না। রাজপথের দু ধার থেকে লাজাঞ্জলি দিতে দিতে পুরনারীরা ভাবলেন, কোন শক্তিমান যুবক চলেছেন পরিণয় বদ্ধ হতে। সেই শোভাযাত্রায় বাদ্যযন্ত্রেরই শুধু প্রভেদ ছিল। মাঙ্গল্য যন্ত্র টিকারা কাড়া নাকড়া ডম্ফ ও খোলের পরিবর্তে সামরিক যন্ত্র জগঝম্প ঢক্কা

তাসা কাড়া ও দামামা। তুমি আসবার আগেই প্রশস্ত রাজপথে তাদের পদধ্বনি মিলিয়ে গেছে।

ভাস্কর যেন কিছু ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন : আমি কোনও বাহিনীর নেতৃত্ব পেলে নিজের যোগ্যতার উপযুক্ত পরিচয় দিতে পারতেম।

অন্ধকারেও দেখতে পেলেম তার পেশীবহুল সুদৃঢ় বাহু দুখানা যুদ্ধ লোভে অস্থির হয়ে উঠেছে।

বললেম : নগরে পুরুষ নেই, দেবালয়ে এখন শুধু নারীর আনাগোনা।

ভাস্কর কিছু বলবার আগেই আমরা বিঠল স্বামীর মন্দির দ্বারে এসে উপস্থিত হলেম। তোরণের উপরেই বাদকেরা বর্হিদ্বারিক বাদ্যযন্ত্রে সন্ধ্যা বন্দনার সময় ঘোষণা করছে। প্রবল নিনাদে বাজছে ঢক্কা ঢোল নৌবৎ ও নাকড়া। প্রাঙ্গণে বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ। অসংখ্য নরনারী নানা বেশে বাসে এই বৈভব বিকীর্ণ করছেন। ভাস্কর কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। বললেন : আজ কোন্ তিথি ব্রাহ্মণ ?

বললেম : আজ কোন পর্ব নেই। দিনমানের শ্রমক্লান্ত নরনারী দেবালয়ে এই পবিত্র পরিবেশের ভিতর বিশ্রাম খুঁজতে আসেন।

নাটমন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাস্কর দাঁড়িয়ে পড়লেন। লক্ষ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে সারা মন্দির প্রাঙ্গণ। সেই আলো প্রতিফলিত হচ্ছে শ্বেত মর্মরের উপর। কী অনির্বচনীয় দেখাচ্ছে কারুকার্য-মণ্ডিত স্তম্ভগুলি। ভাস্কর হতবাক হয়ে গেছেন।

নিঃসংশয়ে চলেছে পুরনারীরা। তাদের চঞ্চল চরণে মঞ্জীর বাজছে মন্দিরার মতো। পরিধানে কাঞ্চীর শাড়িতে কত বর্ণাঢ্য, তার স্বর্ণময় অঞ্চলের দ্যুতিতে চোখে ধাঁধা লাগে। নয়নে নীলাঞ্জন, মুখে লোধ্র রেণুর সঙ্গে চন্দনের মৃদু সৌরভ পাচ্ছি। কানে হীরক খণ্ড, কণ্ঠে মুক্তার হার, কুন্দকলির মালা জড়িয়েছে কবরীবন্ধে। কঙ্কনের শিঞ্জন তুলে লাস্যময়ী ললনারা কলহাস্যে পথ চলেছে। সরে দাঁড়িয়ে আমরা তাদের খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলেম।

ভাস্কর কথা কইলেন না। এক সময় আমিই বললেম : চল, এবারে মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে আসি।

বলে আমরা আবার অগ্রসর হলেম।

ধূপে ও ধূনায় এখন সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে মন্দিরাভ্যন্তর। বাতাসে সৌরভের আকুলতা। পুরোহিতের হাতের পঞ্চ-প্রদীপে কর্পূরের আলোয় দেখলেম বিঠল স্বামীকে, প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর মুখমণ্ডল। দুধারে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করছেন উদাত্ত কণ্ঠে :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্য ধামাণি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

ভাস্করের চোখের পলক আর পড়ে না।

এক সময় তার ধ্যান ভঙ্গ করে বললেম : এই সব নয় বন্ধু, এখানে আরও অনেক মন্দির আছে। নাটমন্দিরে নৃত্য গীতাদি শুরু হবার আগে তোমাকে সে সবও দেখিয়ে আনি চল।

প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাস্কর বললেন : চল।

ঘুরে ঘুরে আমরা আরও সব মন্দির দেখলেম। পার্বতীশ্বরের বৃহৎ বিগ্রহ দেখলেম। দেখলেম রঙ্গনাথজী ও কোদণ্ড স্বামীকে। নরসিংহ স্বামীর মন্দির দেখে ভাস্কর মুগ্ধ হলেন। বিরাট এক খণ্ড প্রস্তর থেকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। স্থাপত্যকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন।

ঘৃত-প্রদীপের মৃদু গন্ধে যেন নেশা আছে। অভিভূত হৃদয়ে ভাস্কর বললেন : এই সব পূজার্চনার ব্যয় কি রাজকোষই বহন করেন ?

বললেম : নিশ্চয়ই। এ নগরে রাজা প্রজায় প্রভেদ শুধু এইখানেই। রাজা শুধু দেবেন আর প্রজারা অঞ্জলি ভরে নেবে। দেবতার পায়ে সর্বস্ব দেবার অধিকার আছে সকল প্রজার। রাজা

কারও দান গ্রহণ করেন না, সবাইকে দান করেন। পার্বনে উৎসবে তাঁর অকৃপণ দান।

বিঠল স্বামীর মন্দিরে বহির্দ্বারিক বাদ্য স্তব্ধ হয়েছে। বললেম: এবারে পা চালিয়ে চল। নাটমন্দিরে নৃত্যগীত শুরু হতে আর বিলম্ব নেই।

ভাস্কর বললেন: আজ কি কোন বিশেষ অধিবেশন আছে?

বললেম: যুদ্ধ জয় করে রামরাজা না ফেরা পর্যন্ত কোথাও কোন বিশেষ অধিবেশন হবে না, এমনি নির্দেশ আছে মহারাজার। এই নৃত্যগীতের ব্যবস্থা দেবপূজার মতো প্রাত্যহিক। বিজয়নগর তো আজকাল মরে আছে। সপ্ত প্রাচীর বেষ্টিত নগরবাসী শঙ্কা জানে না। স্বামীপুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে পুরনারীরা আজ বিরহে বিষণ্ণ হয়ে আছে।

ফেরার পথে আমার একটি কাহিনী মনে পড়ল। ভাস্করকে তা বললেম: বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষোল বৎসর পূর্বে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন ঘিয়াস উদ্দিন তুঘলুক। দরবারে সভায় বা প্রকাশ্যে সঙ্গীতের আলাপ তখন ধর্মবিরুদ্ধ। তবু তিনি দিল্লীর দরবারে গানের আসর নির্দিষ্ট করে গেলেন।

ভাস্কর বললেন: কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা তোমার মনে এল বুঝতে পারলেম না।

বললেম: সেটাও তোমায় বুঝিয়ে দেব। হিন্দু রাজ্যের পবিত্র মন্দিরে সঙ্গীতের আসর বসছে। শত সহস্র পুণ্যার্থী নরনারীর শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে আসছে এই সঙ্গীত। সঙ্গীতকে কোন হিন্দু কোন দিন অপবিত্র মনে করেনি। কেন করে নি, তা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। দেবাদিদেব মহাদেবের কণ্ঠে আমাদের প্রথম সঙ্গীতের উন্মেষ। সেই উদাত্ত সুর-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। সঙ্গীতের জন্য রচনা করলেন পঞ্চম বেদ।

পূর্ণং চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইমং তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥

বললেন,

জপ কোটি গুণং ধ্যানং ধ্যান কোটি গুণং লয়ঃ।
লয় কোটি গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় হত উর্বশী মেনকার নৃত্যগীত, আর্য ঋষিরা সাম গান করেছেন। রামায়ণ গান করেছেন কবি বাল্মীকি আর ব্রজাঙ্গনার কণ্ঠে শোনা গেছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। বিজয়নগরের দেবালয়েও আজ নৃত্যগীত হচ্ছে প্রজানুরঞ্জনের জন্য।

ভাস্কর বললেন: বুঝেছি। তুমি বলছ মুসলমান বাদশাহর ধর্মান্ধতার কথা। কয়েক বছর আগেও প্রকাশ্যে সঙ্গীতের অনুশীলন নিন্দনীয় ছিল মুসলমানের রাজ্যে, এই তো?

বললেম: ঠিক তাই! সঙ্গীত কী দোষে অস্পৃশ্য হল, এই ভেবে আমার বিস্ময় জাগে। কোরাণ-শরিফের ডাক নমাজ কি সঙ্গীতের নামান্তর নয়? মোল্লা যখন তাঁর গম্ভীর কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করেন, সে ধ্বনি কি সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু হতে পারে?

এক রকমের অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ভাস্কর আমার দিকে চাইলেন। হঠাৎ সে দৃষ্টির সামনে কেমন সংকোচ বোধ হল।

বিঠল স্বামীর নাটমন্দিরে তখন মালবীর আলাপ শুরু হয়েছে। চোখের সামনে যেন মালবিকার রূপ ভেসে উঠল:

পীনস্তনী শুভ্রবিলাসনেত্রা নিতম্ববিম্ব প্রতিবদ্ধকাঞ্চী।
মুখারবিন্দ স্মরগীতরম্যা নৃত্যানুগা মালবিকা প্রবীণা॥

নৃত্য-গীতে উৎফুল্ল হয়ে আছেন সুন্দরী মালবিকা।

॥ তিন ॥

দেবদাসীর নৃত্যে ভাস্কর চমৎকৃত হয়েছেন। মন্দির থেকে ফেরার পথে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, বললেন: নৃত্য যে এমন রমণীয় হয় আমার জানা ছিল না।

বললেম: রমণীয় না হলে কি দেবতার সভায় এদের স্থান হত, না দেবালয়ে প্রবেশের অধিকার পেত এই দেবদাসীরা!

মনে পড়ল, এই দেবদাসীরা বিজয়নগরের নয়। মহারাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঞ্জোর জয় করে বৃহদীশ্বরের মন্দির ছেঁচে এই দেবদাসীদের এনেছিলেন। সেও আজ অর্ধ শতাব্দীর পুরাতন কথা। ভরত প্রচলিত নাট্যরীতিই এরা অনুসরণ করে আসছে পুরুষানুক্রমে।

ভাস্কর এবারে অন্য প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন, রাজপুরনারীরা এই দেবদাসীর নৃত্য দেখতে আসেন কিনা। এ সব কথা আমার জানা হয়ে গেছে। অসূর্যম্পশ্যা না হলেও তাঁরা সাধারণ্যা নন। হাজরা রামস্বামীর মন্দিরে তাঁদের স্বতন্ত্র দেবদাসী আছে। ছুরিত নৃত্যের জন্য আছে সাধারণ নর্তক-নর্তকী।

ভাস্কর জিজ্ঞাসা করলেন: সে সভায় কি জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই?

বললেম: সকলের জন্য আছে রাজসভা। তার বাহিরে রাজার যে জীবন, সেটা তাঁর একান্তভাবে নিজের। সর্বসাধারণ সেখানে গিয়ে তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত করবে, তা বাঞ্ছনীয় নয়। উৎসবের দিনে বিশিষ্ট নাগরিকদের রাজা নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন তাঁদের অবাধ অধিকার। অতিথি অভ্যাগতর জন্য যখন নৃত্য গীতের বিশেষ

আয়োজন হয়, তাতে প্রবেশের অনুমতি চেয়েও বিফল হন নি অনেক সাধারণ নাগরিক। তোমার দেখবার শখ থাকলে আমরাও অনুমতি চেয়ে নেব।

ভাস্কর সুখী হলেন এ প্রস্তাবে। খানিকক্ষণ নীরবে পথ চলার পর বললেন : রাজকন্যা গায়ত্রীর কথা তুমি বলছিলে। তিনি তোমার কাছে কী শিক্ষা করেন ?

বললেম : কাব্য।

ভাস্কর জিজ্ঞাসা করলেন : আর কিছু ?

বললেম : কাব্য শেখাবার জন্যই আমি নিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু কাব্যে তাঁব অনুরাগের পরিচয় আজও পাইনি। মনে হচ্ছে, কাব্যকেও তিনি ব্যাকরণের মতো শুষ্ক বিষয় মনে করেন। কাব্য পড়তে পড়তে সমাজতত্ত্বের উপর নানা প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন চৌষট্টি কলার কোন না কোন কলার বিষয়ে। কখনও রাশিচক্রে গ্রহাদির সংস্থান আলোচনা করেন, কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ যাচ্ঞা করেন। আমি আজও তাঁর অনুরাগের বিষয় উপলব্ধি করতে পারি নি।

কোন্ কাব্য নিয়ে আমি তাঁর শিক্ষারম্ভ করেছি, ভাস্কর তা জানতে চাইলেন।

বললেম : চিরাচরিত প্রথায় রামায়ণ দিয়েই শুরু করেছি।

ভাস্কর সহাস্যে আমার বুদ্ধির নিন্দা করলেন। বললেন : রাজকন্যার বয়স অনুমান করেছ কি ?

বললেম : তার প্রয়োজন বোধ করি নি।

ভাস্কর বললেন : তুমি যুবক, তাই সহজ সৌজন্যবশতঃ রাজকন্যার বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা কর নি, বা তার প্রয়োজনও বোধ হয়নি। বৃদ্ধ হলে বুঝতে পারতে যে বয়সের সঙ্গে কাব্যের একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন কাব্য ভাল লাগে। সেই কাব্যেরও বিচার আছে। রামায়ণ শৈশবের কাব্য,

তার রস বোধ হবে পরিণত বয়সে। রসোচ্ছল যৌবনে তার আদর নেই।

একটু থেমে বললেন: তুমি রামায়ণ ছাড় মাধব। গায়ত্রী বালিকা নন তা দেখেছি। তাঁকে কালিদাস দাও, কালিদাসের মেঘদূত আর ঋতু সংহার। যদি তাঁর নাটক ভাল লাগে, দাও শকুন্তলা বিক্রমোর্বশী বা মালবিকাগ্নিমিত্র। দাও ভবভূতির মালতী মাধব আর শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক। বিশ্বনাথ দত্তের মুদ্রারাক্ষসও দিতে পার। কিন্তু কালিদাসের আগে কাউকে দিও না।

আমি যেন অভিভূত হয়ে গেছি। বললেম: থাম ভাস্কর, এক সঙ্গে অত কথা ব'লো না। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

ভাস্কর থামলেন।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলেম, আমার ছাত্র-জীবনের কথা। দ্বাদশ বৎসর ব্যাকরণ পাঠের পর ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি—রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বেদ-বেদান্ত দর্শন ন্যায় স্মৃতি শ্রুতি। কাব্য পড়েছি সকলের শেষে।

ভাস্কর আমার চিন্তাকে অনুসরণ করে বললেন: তোমার নিজের কথা আজ ভুলে যাও মাধব। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, অধ্যয়ন-পিপাসা তোমার বুকের রক্তে, পাণ্ডিত্যের অনুরাগ তোমার অস্থি মজ্জায়। পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র—এরই মীমাংসায় তুমি তোমার সারা জীবন উত্তীর্ণ করতে পার। কিন্তু যাঁকে পড়াতে এসেছ, তিনি ক্ষত্রিয় ললনা। অধ্যয়নের ইচ্ছা তাঁর একটা খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রামায়ণ দিয়ে তাঁর শিক্ষার শুরু করলে কাব্য-পাঠের স্বপ্ন তাঁর অচিরে ভেঙ্গে যাবে। মুনিরা যেমন যজ্ঞে বসে দুঃস্বপ্ন দেখতেন তাড়কার, কিছু দিন পরে তোমার আগমনকেও রাজকন্যা তেমনি কোন ভীতির বস্তু বলে ভাবতে শুরু করবেন।

বললেম: ভাস্কর—

বাধা দিয়ে ভাস্কর বললেন: আমি তোমাকে সত্য কথাই বলছি

মাধব। আমরা ক্ষত্রিয়, সাধনার ধৈর্য আমাদের নেই। থাকলে আমরাও কাব্য রচনা করতে পারতেম।

বললেম: আমি সে কথা বলছি না ভাস্কর। আমি বলছি রামায়ণের কথা। রামায়ণের চেয়ে রমণীয় কাব্য কি আর আছে, না কখনও কোনও দেশে রচিত হবে?

ভাস্কর বললেন: আমি সাহিত্য-বিচার করছি না, করছি রুচির বিচার। রামায়ণে রুচির বয়স আজও রাজকন্যার আসে নি।

চিন্তিত ভাবে বললেম: সে কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখব।

ভাস্কর ব্যস্ত হলেন, বললেন: তুমি কি আমার নাম করবে তাঁর কাছে?

বললেম: যদি আপত্তি না কর, করব।

ভাস্কর ভাবতে লাগলেন।

আমিও ভাবতে লাগলেম। এই নগর, এই পথঘাট, নদীপর্বত সবই এক দিন বালির রাজ্য ছিল। তার নাম ছিল কিষ্কিন্ধ্যা। পঞ্চবটি বন থেকে সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে রাম এই পম্পা নদীতীরে ঋষ্যমূক পর্বতের পাদদেশে হনুমানের দর্শন পেয়েছিলেন। সে দিন তুঙ্গভদ্রার নাম ছিল পম্পা। পম্পা এক সরোবরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। আজ তুঙ্গভদ্রা দক্ষিণে সরে এসেছে, আর পম্পা সরোবর বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে উত্তর তীরে। সেই মতঙ্গ পর্বত, যেখানে বালির ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সুগ্রীব। সেই অঞ্জনা পাহাড়, পবননন্দন হনুমানের জন্মস্থান। সেই শবরী গুহা, মতঙ্গ ঋষির সেবিকা শবরীর আশ্রয় স্থল। সেই মাল্যবান গিরি, রামচন্দ্র যেখানে চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করেছিলেন। আর সেই চিন্তামনি আশ্রম, যেখানে দাঁড়িয়ে বালিকে বধ করেছিলেন ভগবান রামচন্দ্র। আজও সব তেমনিই আছে, নেই শুধু রাম। কিষ্কিন্ধ্যা আজ সদাশিব রায়ের রাজ্য। ভাবলেম, রামায়ণকে জীবন্ত দেখেছে যে দেশ, সে দেশেও কি রামায়ণের আদর হবে না? ভাবলেম, বিজয়নগর-রাজকন্যার যদি ভাল না লাগে তাঁর নিজের

রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস জানতে, তবে কি বিদেশীর ভাল লাগবে এই রামায়ণ? বাল্মীকির রচনা কি আজ ব্যর্থ হয়ে গেল?

অনেক ক্ষণ পর ভাস্কর আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন, বললেন: ইচ্ছে হয় ক'রো। আমার সংকল্পের কথাও গোপন রেখো না তাঁর কাছে। আমি হৃতরাজ্য বটে, হৃতগৌরব নই। দেবগিরির পুনরুদ্ধার করলেই আমার সংকল্প সম্পূর্ণ হবে।

এক সময় আমরা আশ্রমের দ্বারে এসে পৌঁছে গেলেম। তুলসী-মঞ্চে আজ এখনও সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নি।

॥ চার ॥

রাতে আমার ভাবনার অন্ত ছিল না। ভাস্করের কথাগুলোই বারবার ভাবতে লাগলেম। রাজকন্যা কাব্য পড়তে চান। সেই কাব্যে যদি তাঁর অনুরাগ জন্মাতে না পারি, তাহলে আমার শিক্ষাদান সত্যই মূল্যহীন'। অনুরাগের যে সামান্য অঙ্কুরোদ্গমে আমি শৃঙ্গেরী থেকে এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, সে অঙ্কুর যদি অকালে শুকিয়ে যায় তো সে আমারই ব্যর্থতা। ভাস্কর ঠিকই বলছিলেন, অধ্যয়ন ক্ষত্রিয়ের একটা শখ। আজ আছে, কাল নেই। রাজকন্যা যদি হঠাৎ অধ্যয়নে অস্বীকার করেন, সে হবে আমার একটা প্রচণ্ড পরাজয়। ছি ছি করবে নগরবাসী, মঠাধ্যক্ষ আচার্য দেব আমার অকৃতকার্যতার নিন্দা করবেন নির্দয় ভাবে। মনে হল, রাজকন্যার সঙ্গে আমার স্বার্থ যেন কোথায় জড়িয়ে আছে। বুঝি আমার খ্যাতি আছে রাজকন্যার মুখ চেয়ে। তাঁর কাব্যানুরাগের কথা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হলে এ রাজ্যে আমার প্রতিষ্ঠা হবে পণ্ডিত নামে। বিচলিত হলেম, দুরন্ত শীতেও স্বেদসিক্ত হলেম উত্তেজনায়।

ভাস্কর প্রভাতে আমার ক্লান্তি লক্ষ্য করলেন। বললেন: রাতে কি তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছিল?

বললেম: ব্যাঘাত কেউ ঘটায়নি। নিদ্রাদেবী নিজেই কাল ব্যাহত হয়েছিলেন।

অপরাধীর মতো ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: মনে হচ্ছে, আমিই এই ঘটনার জন্য দায়ী। কাল রাতে তোমাকে চিন্তান্বিত দেখেছি। আমিই কি তোমার চিন্তার কারণ?

হেসে বললেম ঃ তুমি গুজরাটরাজ কর্ণদেব নও, আমিও তোমার পূর্বপুরুষ মহারাজা রামচন্দ্র নই, আর এই কুটীরও দেবগিরি থেকে অনেক দূরে। তোমাকে আশ্রয় দেবার সময় আলাউদ্দীনের মতো কারও রোষদৃষ্টির আশঙ্কা আমার নেই। দীর্ঘ দিন হল মালিক কাফুর গত হয়েছেন।

ভাস্করও প্রসন্ন হলেন আমার রহস্যে, বললেন ঃ তবে আজ তোমার কিসের সংশয় ?

বললেম ঃ সে কথা এখন থাক। সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই। চল, তুঙ্গভদ্রার স্নান-ঘাটে সকালের সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করে আসি।

ভাস্কর ভীত হলেন, বললেন ঃ বল কী! এই মাঘের শীতে তুঙ্গভদ্রার হিমস্রোতে নেমে স্নান-আহ্নিক করতে হবে !

তরল হাস্যে মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত করে বললেন ঃ যদি এক তাল তুষার দেখবারই সাধ জেগে থাকে ব্রাহ্মণ, তো তোমার কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জল হাতে নাও, অভিসম্পাত কর তোমার উপবীত স্পর্শ করে। তোমার অভিশাপে না হোক, ঐ কমণ্ডলুর জলে যে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সামান্য কাজের জন্য তুঙ্গভদ্রার তটে নিয়ে যাবার প্রয়োজন দেখি নে।

আমিও হাসলেম অপর্যাপ্ত ভাবে।

ভাস্কর বললেন ঃ ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্র কেন ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন, সেই কথা ভেবে আমার বিস্ময় জাগে।

বললেম ঃ ব্রাহ্মণ জীবনের প্রকৃত রসাস্বাদনের সুযোগ ঘটলে এ প্রশ্ন আর মনে জাগবে না। আচার্যদেব বলেন, এই জগৎটা এক বিরাট মধুচক্র। আমরা তার খোপে খোপে দিবারাত্র মধু সঞ্চয় করছি। যার যত সামর্থ, তার সঞ্চয়ও তত। অদৃশ্য থেকে ঈশ্বর আমাদের কাজ দেখছেন আর হাসছেন। মৌমাছির মতো মানুষও এই মধু আহরণের চেষ্টাতেই তার পরম উদ্দেশ্য ভুলে আছে।

ভাস্কর গম্ভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে এই উক্তির তাৎপর্য তাঁকে বুঝিয়ে দিলেম। বললেম : মৌমাছির কথা ভেবে দেখ। শ্রান্তিহীন শ্রমে তারা ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে মধুচক্রে সঞ্চয় করে। তাদের এই পরিশ্রমের পুরস্কারের কথা ভেবে দেখেছ কি? নির্দয় মানুষ এক দিন সেই মৌচাক ভেঙ্গে সবটুকু মধু কেড়ে নিয়ে যাবে। শূন্য ভাণ্ডার দেখে হায় হায় করবে মধুপরা। তারপর সেই শোক ভুলে এক দিন আবার তারা নূতন করে মধু আহরণে লেগে যাবে।

বললেম : এই সঞ্চয়ের যে কোনও উদ্দেশ্য আছে, মৌমাছিরা তা জানে না। তাদের সঞ্চিত মধুর উপর জীবন ধারণ করে ফুলের জীবনকে যে মধুরতর করে তোলা যায়, সে কথা তাদের জানা নেই। বর্ণকে আরও বিচিত্র, সৌরভকে আরও সুমিষ্ট করে তোলবার কথা তারা ভাবতে শেখেনি। আচার্যদেব বলেন, মানুষের বেলাতেও এ সত্য প্রকট হয়ে উঠছে। সভ্যতাকে উৎকর্ষের পথে চালনা করতে মানুষ আজ ভুলে গেছে। কৃষক শস্যোৎপাদন করে খাদ্যের জন্য, স্থপতি গৃহনির্মাণ করে বাসের জন্য, বৈদ্য চিকিৎসা করেন দেহকে নিরাময় রাখবার জন্য। রাজা মন্ত্রী নগরপাল—শান্তিরক্ষার জন্য সকলেই সদা সচেষ্ট। এ সবই মৌমাছির মধু আহরণের মতো। এর পরিণতি কোথায়, মানুষ আজ আর তা ভাবে না।

ভাস্করের যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, এমনি ভাব দেখলেম তার মুখে। বললেম : সমাজে যখন চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষ যেন কোন দিন মৌমাছির আদর্শ না নেয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যখন তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য দিয়ে সমাজের সকল অভাব অভিযোগ মেটাতে ব্যস্ত থাকবে, ব্রাহ্মণ তাদের পরিশ্রমের ফল খেয়ে সভ্যতাকে সভ্যতর করবার সাধনা করবে। ব্রাহ্মণের এই আদর্শ ছিল বৈদিক যুগে, ব্রাহ্মণের এই আদর্শ ছিল রাম রাজ্যে। যে রাজ্যে এই আদর্শ আদৃত ও সম্মানিত হয়েছে,

তাকেই আমরা আদর্শ রাজ্য বলি। এই আদর্শ ভুলে গোটা জগৎটা একটা বিরাট মধুচক্রে পরিণত হয়েছে।

ভাস্কর বিব্রত ভাবে বললেন: এত দায়িত্ব স্কন্ধে নেবার মতো সাহস আমার নেই বন্ধু, তুমি একাই তোমার আদর্শ পালন কর।

বলে উষ্ণ শয্যার ভিতর আবার আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বললেম: সেই ভাল। তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে গিয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তটুকু উত্তীর্ণ হয়ে না যায়।

বলে কমণ্ডলু হাতে বেরিয়ে পড়লেম।

রাজপথ তখন অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকার অস্বচ্ছ নয়। মাল্যবান গিরির অন্তরালে জ্যোতির্ময় তাঁর প্রকাশের মুহূর্ত গণনা করছেন। আমি তুঙ্গভদ্রার তটের দিকে ছুটে চললেম।

বিজয়নগর এখনও ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে তার রাজপুরী। প্রাসাদের প্রশস্ত অলিন্দের স্ফটিক-দীপাধারে সারি সারি দীপ জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিভে গেছে। রাত্রি শেষের হিমবায়ুর তাড়নায় শৈথিল্য এসেছে প্রহরীর। হাজরা রামস্বামীর মন্দিরে নৌবতে ভৈরব রাগের আলাপ শুরু হলেই এ তন্দ্রাটুকু তাদের কেটে যাবে।

ভাস্করের সঙ্গে বাক্যালাপে আজ আমার দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমাকে চলতে হবে।

রাজ-প্রাসাদের পাশ দিয়েই আমার পথ। কৃষ্ণমর্মরের কঠিন প্রাচীর পথের উপর দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে আছে। মনে হল, সেই ছায়ায় কোন মানুষ অস্থির ভাবে পদচারণা করছে। এমন জায়গায় ঠিক এমনি করে পদচারণা করতে কাউকে দেখি না।

পায়ের গতি আমার মন্থর হল। সাবধান পদক্ষেপে পাদুকার শব্দও হল অন্তর্হিত। আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে দেখলেম, যবনের

পরিচ্ছদ তার দেহে। মনে হল, শত্রুর কোন গুপ্তচর তার সঙ্গীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছে।

পথের পার্শ্বে কমণ্ডলু নামিয়ে রাখলেম এবং অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করলেম। এই আক্রমণের জন্য লোকটা প্রস্তুত ছিল না, কোমরের ঝকঝকে ছোরাখানার দিকে লোলুপ নেত্রে তাকিয়ে প্রাণপণ বলে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি তাকে বাহুপাশে বদ্ধ করেই প্রহরীদের আহ্বান করেছিলেম পরুষকণ্ঠে। ছুটে আসতে তাদের বিলম্ব হল না। শত্রুকে প্রহরীদের হস্তে সমর্পণ করে আমি আমার কমণ্ডলু সংগ্রহ করে নিলেম। পথে আর অন্ধকার নেই। সন্ধ্যার মুহূর্ত উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে দ্রুত পদে ছুটে গেলেম তুঙ্গভদ্রার তীরে।

সন্ধ্যাবন্দনাদি সাঙ্গ করে যখন আশ্রমে ফিরে এলেম, সূর্যের স্বর্ণময় রৌদ্রকিরণে চারি দিক তখন ঝলমল করছে। কুটীরের দ্বারে মালঞ্চে ভাস্কর আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে ফিরতে দেখে প্রসন্ন চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন, বললেন: তোমার বিলম্ব দেখে আমার চিন্তা হচ্ছিল।

বললেম: আমি ক্ষত্রিয়, না নারী, যে আমি কারও চিন্তার কারণ হব!

এমন অদ্ভুত কথা যেন ভাস্কর শোনেন নি, এমনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নারীর তুলনা করছ!

বললেম: শক্তিতে করি না, করি তাদের আস্ফালনে। বিপদকে আহ্বান করতে উভয়েই সমান দক্ষ।

দুজনেই হাসলেম খানিকক্ষণ। তারপর ভাস্কর আবার সেই প্রশ্ন করলেন: সত্যিই আজ তোমার বিলম্ব হয়েছে।

সত্য কথাটুকু স্বীকার করলেম, বললেম: মানসিক চাঞ্চল্যে

আহ্নিকে আজ বিলম্ব হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা আজ আমার পূর্বেই পৌঁছেছিলেন এবং আমার আগেই তাঁরা ফিরে গেলেন।

ভাস্কর সহাস্যে প্রশ্ন করলেন: ব্রাহ্মণের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এমন ঘটনাও ঘটে বিজয়নগরে!

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন উত্তরের জন্য।

বললেম: ঘরণীকে ঘরে ফেলে এসে তপস্বী পুরুষেরও তপস্যার বিঘ্ন ঘটেছে, পড়েছি পুরাণে। আমার দুর্ভাবনা এক ক্ষত্রিয় রাজকুমারের জন্য। মহারাজ সদাশিব রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। সসম্মানে তাঁকে সভায় প্রতিষ্ঠা করব, এরই উপলক্ষ্য খুঁজছি দিবারাত্র। আজ হঠাৎ সেই সুযোগ পেয়ে অন্তরে অস্থিরতা এসেছে।

ভাস্কর কৌতূহলী হলেন, বললেন: তুঙ্গভদ্রার বেলাভূমে তুমি উপলক্ষ্য খুঁজে পেলে?

কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাল তাঁকে।

বললেম: আজ এক শত্রুর চরকে বাহুপাশে বন্দী করেছি। প্রহরীদের কাছে গোপন রেখেছি নিজের পরিচয়। ভাবছি, রাজসভায় গিয়ে তোমাকে এই সম্মান দেব।

প্রত্যূষের ঘটনাটি ভাস্করের কাছে যথাযথ বিবৃত করলেম। শুনে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। বললেন: তোমার ইতিহাসে কী বলে বন্ধু? ব্রাহ্মণ কর্তৃক শত্রু সৈন্য বন্দীর কোন দৃষ্টান্ত কি তার পাতায় আছে?

বললেম: জগতে দৃষ্টান্ত আছে সব কিছুরই, সময় মতো হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারপরই আমার অনুরোধ জানালেম, বললেম: তুমি আপত্তি ক'রো না বন্ধু, আমাকে সুখী করার জন্য রাজসভায় আজ এই গৌরবটুকু তোমাকে নিতে হবে।

ভাস্কর যেন এমন অদ্ভুত কথা কোন দিন শোনেন নি।

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বললেন : এ গৌরব যে তোমার প্রাপ্য ব্রাহ্মণ। তোমাকে বঞ্চিত করতে আমাকে অনুরোধ ক'রো না।

নিজের হাতের মধ্যে তার হাত দুখানা নিয়ে বললেম : আমার অনুরোধ রাখো রাজকুমার। আমার প্রথম অনুরোধ। এ গৌরব কোনও ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য ছিল। আমি ব্রাহ্মণ, আমার গৌরব জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে। ক্ষত্রিয়ের সম্মান নিয়ে আমি কী করব ?

ভাস্কর খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন : প্রহরীরা যে নিজেরা এ কৃতিত্ব গ্রহণ করে নি তা জান ?

এ কথা আমি ভাবি নি। বললেম : তারা মিথ্যা বলবে ?

ভাস্কর হাসলেন, বললেন : ব্রাহ্মণ, তোমার দীক্ষা হয়েছে ত্যাগধর্মে। আমরা অকৃপণ হাতে সেই দান গ্রহণ করে প্রয়োজন মতো অস্বীকার করি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্যের অপলাপ করতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ কখনও সঙ্কোচ করে না।

হঠাৎ আমাদের শ্রবণ উৎকর্ণ হল। রাজঘোষকরা দুন্দুভি বাজিয়ে চলেছে রাজপথ দিয়ে। আমরা তাদের ঘোষণাও শুনলেম। যে নাগরিক আজ শত্রুর গুপ্তচর বন্দী করে কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, মহারাজা আজ প্রকাশ্য সভায় তাঁকে যথোচিত সম্মানের সহিত পুরস্কৃত করবেন। উপযুক্ত প্রমাণসহ তাঁকে আজ পূর্বাহ্ণের দরবারে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। গভীর ভাবে ভাস্করকে বুকে জড়িয়ে বললেম : এ সুযোগ আমাকে হারাতে দিও না বন্ধু।

ভাস্কর আর আপত্তি করলেন না। তার চোখের দৃষ্টি সিক্ত হল কৃতজ্ঞতায়, কিংবা বেদনায়।

।। পাঁচ ।।

দরবারের উদ্দেশ্যে পথে নেমে ভাস্কর দেব একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলেন: রাজকন্যার অধ্যয়নের সময় আজ এই বিপত্তি উপস্থিত হয়েছে। তুমি কি তাঁকে আজ পড়াবে না?

বললেম: একে তুমি বিপত্তি কেন বলছ ভাস্কর? আমি আজ এক হৃতরাজ্য হিন্দু রাজকুমারের প্রতিষ্ঠার পথ দেখাবার সুযোগ পেয়েছি। আজ আমার শিষ্যার অনধ্যায়, সেই কথাটি জানিয়ে দিলেই আমার ছুটি।

ভাস্কর কথা বললেন না। আমিই আবার বললেম: রাজকন্যাকে এই সংবাদটুকু পরিবেশনের জন্যই আজ এত আগে আমি বেরিয়েছি। অসময়ে যাচ্ছি বলে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না। তুমি দরবার-গৃহেই আমার অপেক্ষা ক'রো।

উত্তরীয় ও উপবীতে ভাস্করকে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। কপালে চন্দনের তিলক, পায়ে কাঠের পাদুকা। অনভ্যাসের জন্য পদক্ষেপ ব্যহত হচ্ছে। এক সময় ভাস্কর বললেন: বুঝি না, কেন এ অভিনয় করাচ্ছ।

বললেম: ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, তোমাকে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। সেই প্রহরীদ্বয় নিশ্চয়ই সভায় উপস্থিত থাকবে, তোমার ক্ষত্রিয়ের বেশ দেখে কি তারা সন্দেহ প্রকাশ করবে না ভাব?

ভাস্কর বললেন: তোমার যুক্তি মানি, কিন্তু অভিনয়টা যে সুষ্ঠু ভাবে করতে পারছি না। এই দেখ—

বলে ভাস্কর আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। পায়ের খড়ম খুলে

ছিটকে পড়েছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেটা সংগ্রহ করে বললেন: ব্রাহ্মণ সাজার এত বিপদ তা জানতেম না।

আমি হাসতে লাগলেম, বললেম: এই পথটুকু অতিক্রম করতেই সব কৌশল আয়ত্ত হয়ে যাবে।

দক্ষিণ থেকে বাতাস এল এক ঝলক। বিপর্যস্ত হল ভাস্করের উত্তরীয়। কোন রকমে সেখানা সামলে নিয়ে বললেন: তার আগেই অপদস্থ না হলে বাঁচি।

একবার সামনে পিছনে তাকিয়ে বললেন: এটি সংকীর্ণ পথ, তাই রক্ষা। প্রশস্ত রাজপথে গিয়ে পড়লে তোমার সম্মান বোধ হয় রক্ষা করতে পারব না।

আমার মনে পড়ল পাঠশালার জীবনের কথা। দুখানা বংশদণ্ডের গায়ে পাদুকা নির্মাণ করে তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা ছুটোছুটি খেলা করতেম। এ আমার একার কৃতিত্ব নয়, গুরুগৃহে সকল শিষ্যেরাই আমরা নিশ্চিন্তে এই খেলায় যোগ দিয়েছি। আজ ভাস্করের অবস্থা দেখে তার ভয় ও ভাবনা অনুভব করে আমার শুধু হাসতে ইচ্ছা হল।

এক সময় আমরা সঙ্কীর্ণ পথ ছেড়ে মূল রাজপথে এসে উপস্থিত হলেম। এই রাজপথ সরল ভাবে গেছে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। পথের যে কোন স্থান থেকে প্রাসাদের সুউচ্চ তোরণ দ্বার পথিকের দৃষ্টি রঞ্জন করে।

রাজপথে আজ একেবারে ভিড় নেই। ভাস্করের কৌতূহল আমি নিবৃত্তি করলেম, বললেম: নগরীকে আজ মৃত মনে হচ্ছে, তাই না? সত্যিই আজ এর প্রাণ নেই। এখন এখানে আমরা ব্রাহ্মণেরা আছি। আছে শিশু ও পুরবাসিনীরা। আর কিছু রাজপুরুষ আছেন, যাদের একান্ত ভাবে নগর-রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

বিস্মিত হয়ে ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: তাহলে একটি মাত্র যুদ্ধের ফলাফলের উপর বিজয়নগরের ভাগ্য নির্ভর করছে বল?

সে কথা স্বীকার করলেম।

ভাস্কর এই নীতির প্রশংসা করলেন না, বললেন: যুদ্ধের রীতি আজকাল পালটে গেছে। একটি মাত্র স্থানে শত্রুকে বাধা দেবার চেষ্টা যে কত বড় ভুল, তা বারে বারে দেখেও আমরা শিক্ষা নিচ্ছি না। রাজায় রাজায় আজ আর পরাক্রমের পরীক্ষা হয় না। সেনাবাহিনীও রাজার পিছনে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থেকে মল্লযুদ্ধের আনন্দটুকু উপভোগ করে না। কোন এক পক্ষের সেনাপতির পতন হলেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। সেনাপতির ছিন্নমুণ্ড শূল-বিদ্ধ দেখলেই যুদ্ধরত সেনাদল রণে ভঙ্গ দিয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করে। শত্রু-সৈন্যকে তখন আর ঠেকানো যায় না। লুটপাট ধ্বংসলীলায় তারা মত্ত হয়ে ওঠে। দেশকে দেশবাসীকে অত্যাচারের হাত থেকে তখন আর বাঁচানো সম্ভব হয় না।

একটু থেমে ভাস্কর বললেন: যে যুগে রাজায় রাজায় লড়াই হত, প্রজার দুঃখ ছিল না সে যুগে। মল্লযুদ্ধে এক রাজা পরাজিত বা নিহত হলেই সেই পরাজয় যুদ্ধের ফলাফল বলে পরিগণিত হত। বিজয়ী রাজা সগৌরবে শত্রুরাজ্যের অধিকার গ্রহণ করতেন। কখনও বা বিজিত রাজ্যকে আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করে পরাজিত রাজাকেই সামন্তরাজ বলে স্বীকার করতেন। যুদ্ধে রাজার ভাগ্য নির্ণয় হত, প্রজাদের নয়।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর ভাস্কর আবার কথা বললেন: মাধব, তুমি কী ভাবছ জানি না, আমি এই যুদ্ধ-নীতির নিন্দাই করছি। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে এ নগরের নিস্তার নেই।

বললেম: ভাস্কর, এ নগর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে কত সুরক্ষিত, মতঙ্গ পর্বতের উপর আরোহণ করলে তা প্রত্যক্ষ করবে। তুঙ্গভদ্রা এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিতা। নগর শুধু দক্ষিণেই নয়, উত্তর তটেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। চারি দিকে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা, রামায়ণের যুগে যা কিষ্কিন্ধ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পর্বত

যেখানে একের সঙ্গে অপরটি সংযুক্ত নয়, সেখানে প্রাচীর নির্মাণ করে গণ্ডশৈলগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। এক আধটি নয়, সাতটি প্রাচীর বেষ্টিত বিজয়নগর। এক সময় অরক্ষিত ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমা। নিম্নভূমি বলে সেখানে প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তাই পরিখার ন্যায় দুই ক্রোশব্যাপী জলাশয় খনন করে দক্ষিণ সীমাকেও সুরক্ষিত করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ সিংহদ্বারের ভিতর এই নগরীর বিস্তার সাড়ে তিন ক্রোশ। দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও এ নগরীর খাদ্যাভাব কখনও হবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে এর কৃষিক্ষেত্রে কৃষকেরা নির্বিঘ্নে নির্ভীক চিত্তে প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাচীরের মধ্যে ফল ও ফুলের উদ্যান ও পশুচারণ ক্ষেত্র। তৃতীয় থেকে সপ্তম প্রাচীরের মধ্যে জনবহুল নগর, গৃহ ও বিপণি-আকীর্ণ প্রশস্ত নগর।

পথিপার্শ্বের মর্মরময় উচ্চ বেদীগুলি আজ জনবিরল। সোপান-শ্রেণীতে ক্রেতা ও বিক্রেতার ঠেলাঠেলি নেই। কুন্দের মালা বিছিয়ে বসেছে মালিনী, গোলাপে রঙীন হয়ে আছে তার চারপাশটুকু। মণিকার বসে আছে মণিমুক্তার সম্ভার সাজিয়ে। হীরা মুক্তা মরকত পদ্মরাগ পুষ্পরাগ ও বৈদূর্যমণির উপর সূর্যকিরণ পড়ে বিচিত্র বর্ণবিভা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত করছে। গ্রামের হাটে যেমন লাজের পশরা নিয়ে বসে গ্রাম্য প্রসারিক, বিজয়নগরের রাজপথে রত্নের পশরা নিয়ে বসছে স্বর্ণ ও মণিকার।

মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্কর দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। বললেন: এই সবই কি বিজয়নগরের জিনিস?

বললেম: অনেক জিনিসই আসে বিদেশ থেকে। হীরক ও চুনি আসে পেগু থেকে, চীন আলেকজান্দ্রিয়া ও কুনাবার থেকে আসে রেশম, মলবার থেকে কর্পূর মৃগনাভি পিপুলি ও চন্দন।

ভাস্কর স্বগতোক্তি করলেন: নিজের চোখকে যে বিশ্বাস হয় না মাধব।

বললেম : তোমার তো অবিশ্বাসের হেতু নেই রাজকুমার তোমার পূর্বপুরুষ মহারাজা রামচন্দ্র যখন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির সঙ্গে সন্ধি করলেন, তখন তাঁকে ছয় মণ মুক্তা, দুই মণ হীরক, দুই মণ পদ্মরাগ, দুই মণ মরকত ও দুই মণ বৈদূর্যমণি প্রদান করেছিলেন বলে শুনেছি। পনের বৎসর পরে মালিক কাফুর যখন পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করেন, তখনও তাঁকে এই পরিমাণ ধনরত্ন দিতে হয়। ওরঙ্গলের রাজা প্রতাপ রুদ্রও তো মালিক কাফুরকে অনেক মণিমুক্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেই কি দক্ষিণ ভারত দরিদ্র হয়ে গেছে? এ দেশের মাটির নিচে সোনা, জলের নিচে মুক্তা। মাটি আর জলের মতো অফুরন্ত তাদের উৎস।

পথ চলতে শুরু করে ভাস্কর বললেন : পিতৃপুরুষের কাছে এই সমৃদ্ধির কথা শুনেছি, কিন্তু শুধু গল্প বলেই মনে হয়েছে তাকে। এমন ঐশ্বর্য আমি কোথাও দেখিনি।

বললেম : বাল্মীকির শ্লোকে অযোধ্যার বর্ণনা তুমি পড়েছ ভাস্কর?

ভাস্কর মাথা নেড়ে বললেন : পড়ি নি।

বললেম : সেও এক অদ্ভুত নগরী ছিল। রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বাল্মীকি এই নগরীর বর্ণনা করেছেন। দ্বাদশ যোজনায়তা অযোধ্যা ছিল পরিখা-বেষ্টিত জলদুর্গম। সুবিস্তৃত রাজপথ, ধ্বজাশালী অট্টালিকা, পুষ্পবিকীর্ণ উদ্যান ও আম্রকানন। স্থানে স্থানে অস্ত্রাগার ও তোরণদ্বার। পরিখার বাহিরে দুই যোজন পর্যন্ত স্থান অযোধ্যা নামে পরিচিত ছিল। সে স্থান মেখলার মতো শালবৃক্ষ পরিবৃত। শত্রুর সাধ্য ছিল না এ স্থানে প্রবেশ করে। খাদ্যের অভাব ছিল না, ছিল ইক্ষুরসের মতো সুমিষ্ট পানীয় জল। অভাবের নাম শোনেনি অযোধ্যার প্রজামণ্ডলী। তারা দীর্ঘায়ু সৎ ধার্মিক ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। সর্বশ্রেণীর শিল্পী ছিল নগরে, ছিল নানা দেশের বণিক ও রাজদূত। আর সকলের প্রমোদের জন্য ছিল সীমন্তিনীদের নাট্যশালা।

ভাস্কর বাধা দিলেন, বললেন: কিন্তু এমন মণি-মাণিক্যের বিপণির বর্ণনা আছে কি রামায়ণে?

চিন্তা না করেই এ কথা সমর্থন করতে হল। বললেম: তা নেই। মনে হয় সাধারণের জীবনযাত্রায় মণি-মাণিক্য তখনও খুব মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়নি। সে যুগে সকল ঐশ্বর্যের সেরা ছিল ত্যাগ, আর পার্থিব ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ছিলেন যক্ষ কুবের। যক্ষ আমাদের আরাধ্য দেবতা নন।

এক স্থানে এসে ভাস্কর দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন: আমরা কি রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেলেম?

বললেম: না, এ রাজপ্রাসাদ নয়—ধর্মাধিকরণ। এই সুন্দর এবং বৃহৎ প্রাসাদটি মন্ত্রীর জন্য নির্মিত। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে যে উচ্চ মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, তাতে উপবেশন করে একজন রাজপুরুষ এখন শাসনকার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁর নিচে দেখ, আসা সোঁটা ছত্র ও ব্যজনী নিয়ে চোপদাররা অপেক্ষা করছে। এদের ভিতর ছত্রবাহক আছে সাতজন। বাহিরে দেখ, নৌবৎ বাদকের সঙ্গে স্তাবকেরা সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। রাজকার্য সমাপ্ত করে রাজপুরুষ যখন দরবার অভিমুখে যাত্রা করবেন, তখন এরা শোভাযাত্রা করে সঙ্গে যাবে।

ভাস্কর আবার পথ চলতে শুরু করলেন। খানিকটা অগ্রসর হয়ে বললেম: এইবার বিজয়নগর রাজ্যের টঙ্কশাল দেখ।

বলে বামে একটি অট্টালিকার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেম।

স্বাধীন রাজা মাত্রেরই নিজের মুদ্রা থাকে, ভাস্কর তা জানেন। কিন্তু বিজয়নগর রাজ্যের মুদ্রা তাঁর দেখা নেই। বললেন: এ রাজ্যের মুদ্রা আমি আজও দেখি নি।

আমি দেখেছি। বললেম: এ রাজ্যে পাঁচ প্রকার মুদ্রা প্রচলিত আছে—তাম্র, রৌপ্য ও তিন প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা।

তখন আমরা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারেরর ভিতর প্রবেশ করছি।

তোরণের দুই পার্শ্বে দুটি বিরাট কামান, অগ্নি উদ্গীরণের জন্য অপেক্ষা করে আছে। বর্শা হস্তে সুসজ্জিত দ্বারীরা প্রহরারত। তাদের বক্ষের উপর শোভা পাচ্ছে গণ্ডক-চর্মের বৃত্তাকার ঢাল।

ভাস্করের মুগ্ধ হবার পালা শেষ হয় নি। নানা বর্ণে নানা বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সম্মুখের উদ্যান। এত ফুল বুঝি ভাস্কর কখনও এক সঙ্গে দেখেন নি, এত রঙ এত সৌরভ এমন মদির মধুর নেশায় প্রমত্ত পরিবেশ।

এক ধারে একটি স্বচ্ছ জলের পুষ্করিণী। তার সলিল স্পর্শ করে আছে শ্বেত মর্মরের সোপান শ্রেণী। খানিকটা স্থান পদ্ম পাতায় ছেয়ে আছে। আর একটা ধারে রক্তবর্ণের ফুলও ফুটেছে গোটা কয়েক। শান্ত নীল জলে মরাল মিথুন নিশ্চিন্ত ক্রীড়ারত।

ভাস্করের হঠাৎ কবিত্ব জাগল মনে। বললেন: মহাকবি কালিদাস কি বিজয়নগর দেখেছিলেন তাঁর উত্তর মেঘ লেখবার আগে?

কালিদাস প্রাচীন ভারতের কবি। বিক্রমাদিত্যের উজ্জায়না নগরে বসে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। দৃষ্টি দিয়ে আমি আমার বিস্ময় জ্ঞাপন করলেম ভাস্করকে।

ভাস্কর বললেন: ঠিক এমনি কোন দৃশ্যের বর্ণনা কি পড়নি তাঁর কাব্যে?

বলে অঙ্গুলি সংকেতে সেই সরোবর দেখিয়ে দিলেন, আর সেই মরাল-মিথুন। মনে পড়ল্:

বাপীচাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধ সোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদুর্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যাপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্যহংসাঃ॥

শ্লোকটি আবৃত্তি করতেই ভাস্কর উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন: দেখলেতো ব্রাহ্মণ, আমরাও নিতান্ত মূর্খ নই। প্রয়োজন মতো আমরাও উপমা দিতে পারি।

বললেমঃ ক্ষত্রিয় মানে তো মুর্খ নয় বন্ধু। আর ক্ষত্রিয় রাজারাই তো বিদ্যোৎসাহী হয়ে থাকেন। যে বংশে তোমার জন্ম, বিদ্যানুরাগী বলে সে বংশের খ্যাতি আছে। মহারাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে সংস্কৃত কবি হেমাদ্রির যশ ও খ্যাতি দিকে দিকে প্রসার লাভ করেছিল। ইনি হেমাদপন্থ নামেই সমধিক পরিচিত। হিন্দুর ধর্মনীতির যে সংকলন ইনি প্রচার করেন, আজও তা সযত্নে পঠিত হচ্ছে।

ভাস্কর আমার মুখের দিকে তাকালেন। মনে হল, তাঁর পূর্বপুরুষের এই কীর্তিটুকু তাঁর জানা ছিলনা।

আমরা তখন দরবার গৃহের সম্মুখে পৌঁছে গেছি। সেই বিরাট গৃহের সুবর্ণমণ্ডিত দ্বার দেখিয়ে বললেমঃ তুমি তোমার আসন গ্রহণ কর। আমি রাজকন্যা গায়ত্রীকে আমার বক্তব্য জানিয়ে যত শীঘ্র পারি ফিরে আসছি।

ভাস্কর অগ্রসর হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে পিছনে ডেকে বললেমঃ ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র আসন আছে।

প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল ভাস্করের মুখমণ্ডল।

॥ ছয় ॥

রাজকন্যার অধ্যয়ন কক্ষ আজ শূন্য। মখমলের মসলন্দের উপর পাঠের সরঞ্জাম রাখে নি পরিচারিকা। উত্তরে তুঙ্গভদ্রার স্রোতে তার পুরাতন কলস্বর। মন্দ মলয়ে বাতায়নের রেশমী যবনিকা মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে।

অধ্যয়নে বসবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাজকন্যা উপস্থিত নেই। কখনও এমন হয় না। তাই বিস্ময় জাগল মনে।

অন্তঃপুর থেকে সহচরী সরস্বতী ফিরে এল, বলল : রাজকন্যা আজ অসুস্থ। তিনি আজ অধ্যয়নে অসমর্থ বলে মনে হচ্ছে।

রাজকন্যা অসুস্থ! কী এমন অসুস্থতা যে নিজে এসে অক্ষমতা জানাতে পারেন না। তাঁর এই অশিষ্ট আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারলেম না। পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে প্রস্থানের উদ্যোগ করলেম।

সরস্বতী বাধা দিল, বলল : ফিরে যাবেন না গুরুদেব, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাজকন্যা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ফিরে দাঁড়ালেম।

সরস্বতী বলল : আসন গ্রহণ করুন। আপনাকে সবই নিবেদন করছি।

এবারে মনে হল, শারীরিক অসুস্থতা নয় রাজকন্যার, মানসিক উদ্বেগে তিনি পীড়িত হচ্ছেন। মসলন্দ থেকে খানিকটা দূরে আমার দর্ভাসনে উপবেশন করলেম।

চারি দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে সরস্বতী বলল : রাজকন্যা এখন স্নানাগারে। বেশ বিন্যাস সমাপ্ত করে এখানে আসতে তাঁর

কিছু বিলম্ব হবে। এই অবসরে তাঁর অসুস্থতার আসল কারণ আপনাকে জানিয়ে রাখি।

আর একবার দেখল চারিদিক, তারপর বলল: রাজপ্রাসাদের ভিতর আজ প্রত্যুষে এক যবন সেনা বন্দী হয়েছে জানেন?

বললেম: ভিতরে না বাহিরে?

সরস্বতী বলল: বাহিরে নয়, ভিতরেই।

বললেম: আমি জানি, প্রাসাদের বাহিরে প্রশস্ত রাজপথের উপর এক যবন সৈন্য ধৃত হয়েছে। দেবগিরির হৃতরাজ্য রাজকুমার ব্রাহ্ম মুহূর্তে আজ তাকে বন্দী করেছেন!

বিস্ময়ে হতবাক হল সরস্বতী।

বললেম: সত্যকথা। তুঙ্গভদ্রার পবিত্র জলে স্নান বন্দনাদি করবার জন্য রাজকুমার একাকী পদব্রজে যাচ্ছিলেন ব্রাহ্মণের বেশে। শত্রুর চর সন্দেহে রাজকুমার বাহুবলে তাকে বন্দী করে প্রহরীদের হস্তে অর্পণ করেছেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সরস্বতী কথা কইল অনেকক্ষণ পরে। বলল: প্রাসাদের ভিতরেও একজন বন্দী হয়েছে।

আমিও এমনি একটা দুর্ঘটনার সঙ্কেত পেয়েছিলেম। বাহিরের যবনটি যে ব্যগ্র ভাবে ভিতরের লোকের প্রতীক্ষা করছিল, সরস্বতীর কথায় আমার সে সন্দেহ সমর্থিত হল। বললেম: দেবগিরির রাজকুমারও এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

রাজকুমারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জানবার বাসনা প্রকাশ করল সরস্বতী, বলল: আপনার—

প্রশ্ন সম্পূর্ণ করবার আগেই উত্তর দিয়ে দিলেম: আমার অতিথি তিনি।

সরস্বতী বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল: ব্রাহ্মণের অতিথি ক্ষত্রিয়!

বললেম: শিক্ষার্থীর জাতি বর্ণ নেই। শৈশবে একই

পাঠশালায় একত্র অধ্যয়ন করেছি। বর্ণের বিচার তাই আজও করি না।

সরস্বতী আবার দেখল চারি দিক। মনে হল, তার বলবার কথা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অসঙ্কোচে সবটুকু না জানিয়ে সে স্বস্তি পাচ্ছে না। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে বলল: জানা গেছে, সেই যবন সৈন্য বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহের চর।

বললেম: তালিকোটে সমবেত কোনও সুলতানের যে চর তাতে সন্দেহ নেই।

কী উদ্দেশ্যে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল জানেন?

সকৌতুকে প্রশ্ন করল সরস্বতী।

জানি না স্বীকার করলেম।

আরও নিম্নস্বরে সরস্বতী নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, বলল: রাজকন্যার সংবাদের জন্য।

নিকটে বজ্রপাত হলেও এমন চমকিত হতেম না। এত বড় লড়াই বেধেছে কৃষ্ণার তীরে, আর বিজাপুরের সুলতান আজ রাজকন্যার সংবাদ সংগ্রহ করছেন!

আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে সরস্বতী বলল: আমি মিথ্যা বলছি না গুরুদেব। সেই চরই এই সত্য প্রকাশ করেছে। বলেছে, তালিকোটের যুদ্ধে যখন জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী, তখন লুটের ভাগ বাটোয়ারা আগে থেকেই করা ভাল। মহারাজ সদাশিব রায়ের মাতুল তিম্মরাজ আলি আদিল শাহের বন্ধু ছিলেন। তাঁকে বঞ্চনা করেছেন রামরাজা। সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে আদিলশাহী রাজ্যের কিয়দংশ সম্প্রতি রামরাজা নিজ রাজ্যের সামিল করেছেন।

সরস্বতী বাহিরে গিয়ে চারিধারটা ভাল করে দেখে এল, বলল: সুলতান এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন রাজকন্যাকে—

বাক্য সম্পূর্ণ করবার সাহস হল না প্রগল্‌ভা সরস্বতীর। তাকে আশ্বাস দেবার জন্য বললেম: বুঝেছি।

আমি তার অব্যক্ত আশঙ্কাটুকু অনুমান করতে পেরেছি দেখে মনে মনে সে খানিকটা আরাম পেল। বলল : দুর্ভাবনায় আমরাও মরে যাচ্ছি।

বললেম : দুর্ভাবনার কথাই বটে।

সরস্বতী শঙ্কিত হল। বলল : আপনিও বলছেন দুর্ভাবনার কথা! আমাদের জয়ের আশা কি সত্যিই নেই?

নিজের ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করে বললেম : না না, সে কথা আমি বলছি না। আমাদের এমন উপযুক্ত সেনাপতির পরিচালনায় এমন সুষ্ঠু সেনা সমাবেশ হয়েছে, জয়ের আশাই তো আমরা করছি। আমি দুর্ভাবনার কথা বলছিলেম অন্য কারণে। চারি দিকে শত্রু সৃষ্টি করে নিশ্চিন্ত থাকবার তো উপায় নেই।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে সরস্বতী বলল : রাজকুমার ভেঙ্কটাদ্রি রাজকন্যাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে গেছেন।

ভেঙ্কটাদ্রি রাজকন্যার ভ্রাতা নন। তাই একটা প্রশ্ন অপরিহার্য মনে হল। জিজ্ঞাসা করলেম : রামরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভেঙ্কটাদ্রি?

সরস্বতী তার মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল। নিম্ন স্বরে বলল : সংবাদটা জানেন না বুঝি?

আমি মাথা নেড়ে আমার অজ্ঞানতা প্রকাশ করলেম।

সরস্বতী আবার একবার চারি দিক দেখে নিল। বলল : ভেঙ্কটাদ্রি আজকাল রাজকন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। রামরাজের ইচ্ছা, বিজয়নগর রাজ্যের উত্তরাধিকারী হোক তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রয়োজন হলে ছল বল কৌশল সবই প্রয়োগ করতে হবে।

বিস্মিত হয়ে বললেম : মহারাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন?

সরস্বতী হেসে বলল : আপনি তো জানেন গুরুদেব, মহারাজের মতামতের অপেক্ষা রাখেন না শক্তিমান রামরাজা। মহারাজের

চোখের সামনে দিয়ে ভেঙ্কটাদ্রি আসছেন রাজ অন্তঃপুরে। রাজকন্যার সম্মতি হলেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে।

একটা অবান্তর প্রশ্ন মনে এল, বললেম : আর রাজকন্যা সম্মত না হলে—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সরস্বতী। তার মুখের হাসিটি মনে হল রোদনের মতো বেদনার্ত। বলল : নারীর স্বাতন্ত্র্য আর কতটুকু গুরুদেব, পুরুষের প্রয়োজনের কাছে নিয়তই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে।

কেন জানি না, বড় আঘাত পেলেম মনে। সেই পরম পুরুষ যখন নারী সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর মনে কি এই ছিল? শক্তি কেন অত্যাচারে পরিণত হবে! শক্তির সাধনাতো সমাজের কল্যাণের জন্য!

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। আমি এই নিস্তব্ধতার ভিতর এক উৎপীড়িত নারীর ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছিলেম। স্পষ্ট করে না বললেও বুঝতে পেরেছি যে রাজকন্যার সম্মতি নেই এ বিবাহে। তবু তাঁকে সম্মতি দিতে হবে। অন্তরের সঙ্গে জিহ্বার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। অন্তরের দাবীকে দমন করে জিহ্বাকে পরাধীন করতে হবে। অভিনেত্রীর মতো নিষ্ঠার সঙ্গে এই অভিনয়টুকু করতে না পারলেই অনর্থ বাধবে। তালিকোটে জয়-পরাজয়ের উপর বিজয়নগর যেমন নির্ভর করে আছে, এই নারীর জীবন্মৃত্যুও চেয়ে আছে পাশার একটি মাত্র চালের উপর। একটুখানি হিসেবের ভুল হলেই জীবন নত হবে মৃত্যুর কাছে। জোড়াতালি দেওয়া তো মৃত্যুরই অন্য রূপ।

বাষ্পাচ্ছন্ন দেখলেম সরস্বতীর দৃষ্টি।

রাজকন্যা আসছেন।

বলে পালিয়ে গেল। পালাবার প্রয়োজন হয়েছিল আত্মগোপনের জন্য।

প্রণাম করে রাজকন্যা ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বললেন: হঠাৎ আজ আমি পীড়িত হয়ে পড়েছি গুরুদেব। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছি না।

পীড়ার কারণ আমার জানা ছিল। তবু আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি তাঁর চোখের উপর মেলে ধরলেম।

রাজকন্যা বললেন: রাত্রি শেষে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গেছে। দেখলেম, বিরূপাক্ষ দেবের পূজার নৈবেদ্য কে আজ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিয়েছে। শৃগাল কুকুর শকুনি গৃধিনী এসেছে চারি দিক হতে।

রাজকন্যা ভয়ে দু চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

নিজের অজ্ঞাতসারে আমিও বোধ হয় একবার কেঁপে উঠলেম।

বিরূপাক্ষ মন্দিরে পদ্মাবতীশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মাধবাচার্য বিদ্যারণ্য। বিশাল গোপুর ও শিবালয়। সম্মুখে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত তার বিস্তীর্ণ মণ্ডপ। পুরোভাগে তিপ্পকুল পুষ্করিণী। সলিল স্পর্শ করে আছে মর্মরের সোপান। শঙ্করাচারী নামে তাঁর শিষ্যপরম্পরা আজও তাঁর উপাসনার স্থান ও সমাধি ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করছেন পরম নিষ্ঠায়। মনে হল, বিজয়নগরের চরম দুর্দিনের ইঙ্গিত আছে রাজকন্যার এই স্বপ্নের মধ্যে।

এক সময় গায়ত্রী চোখ খুললেন, বললেন: তারপর কী দেখলেম জানেন? দেখলেম, পূজার নৈবেদ্য আর নেই, আমাকে ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাচ্ছে চারি দিকের পশুপাখীগুলো।

আতঙ্কে কম্পিত হল রাজকন্যার তনু দেহ।

তাঁকে সাহস দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। বললেম: বাস্তবের মতো স্বপ্নও মনকে সমান পীড়া দেয়। স্বপ্ন তবু স্বপ্নই, স্বপ্নকে সত্য ভেবে বাস্তবকে বিড়ম্বিত করার প্রয়োজন দেখি না।

অসহিষ্ণু ভাবে রাজকন্যা বললেন: কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই

আমি যে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব। কিছুতেই যে আজ মনস্থির করতে পারছি না!

বললেম: আমি ফিরে গিয়ে এক খণ্ড গীতা তোমাকে উপহার পাঠিয়ে দিচ্ছি। গীতায় মন দাও, সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ করবে।

আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন প্রভু।

রাজকন্যা নত হয়ে আবার প্রণাম করলেন।

আমি উঠে দাঁড়ালেম, বললেম: আজ আমিও একটু ব্যস্ত আছি। দেবগিরির রাজকুমার আমার অতিথি হয়েছেন।

বড় বড় চোখ জোড়া তুলে রাজকন্যা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললেম: একটু ভুল হল। রাজবংশে জন্ম বলেই তাঁকে রাজকুমার বলছি। মহারাজা রামচন্দ্রের বংশে তাঁর জন্ম।

মহারাজা রামচন্দ্রের নাম রাজকন্যা শুনেছেন কি না জানি না। তাই বললেম: রামচন্দ্রের দেবগিরি আজ মুসলমানের দৌলতাবাদ। রাজ্যচ্যুত ভাস্করদেব এসেছেন আমার কুটীরে।

ভাস্কর দেবের বীর্যের গল্পটুকুও শুনিয়ে দিলেম। বললেম: রাজকুমার তাঁর হৃত রাজ্য উদ্ধার করবেন বলে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। তাঁর পরাক্রমের প্রথম পরিচয় দিলেন সুলতান আলি আদিলশাহর চরকে বাহুবলে বন্দী করে।

সহচরী সরস্বতী কখন ফিরে এসে আমার পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিল, লক্ষ্য করিনি। তার প্রশ্ন শুনে তার প্রত্যাগমন জানতে পারলেম। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল: ভাস্কর দেব কি সম্প্রতি তাঁর রাজ্য হারিয়েছেন?

ইতিহাসে তার অজ্ঞানতা দেখে আশ্চর্য হলেম, বললেম: ভাস্কর দেবরা রাজ্য হারিয়েছেন আজ প্রায় আড়াই শো বৎসর আগে। রাজ্য উদ্ধারের জন্য তাঁর পিতৃপুরুষেরা কী চেষ্টা করেছেন জানি

না। তবে মনে হয়, সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য পেলেই এই তরুণ রাজকুমার দৌলতাবাদের যবন সেনা বিতাড়িত করতে পারবেন। তাঁর বাহুতে বল আছে, বুদ্ধিতে ধার আছে, আর হৃদয়ে বিশ্বাস আছে। এঁর উদ্যম যে বিফল হবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

রাজকন্যা কথা কইলেন না। উত্তর দিল সরস্বতী, বলল ঃ বিজয়নগরে তো অর্থাভাব নেই গুরুদেব।

বললেম ঃ তা ঠিক। কিন্তু একের ঐশ্বর্য যে অপরের ভোগে লাগে না। তা যদি লাগত, তাহলে জগতের কাড়াকাড়ি হানাহানি এক দিনেই বন্ধ হয়ে যেত।

সরস্বতী করুণ চোখে রাজকন্যার দিকে তাকাল। আমি তাদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেম।

॥ সাত ॥

রাজসভায় যখন নেমে এলেম, তখনও সভা আরম্ভ হতে অনেক বিলম্ব ছিল। ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট আসনে ভাস্করকে দেখতে পেলেম না। সভায় তখনও লোক সমাগম সম্পূর্ণ হয় নি। একটুখানি খুঁজতেই তাঁকে দেওয়ালের কাছে দেখতে পেলেম। ভাস্কর নিবিষ্ট-চিত্তে দেওয়ালের তৈলচিত্রগুলি নিরীক্ষণ করছেন। বললেম: এই দিকে এস, এইখানে বিজয়নগরের পত্তন।

বলে দক্ষিণের দেওয়ালে প্রথম ছবিখানির কাছে নিয়ে গেলেম। যজ্ঞোপবীতের উপর উত্তরীয় জড়িয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন এক ব্রাহ্মণ। তাঁর ওষ্ঠে দৃঢ়তা, দৃষ্টিতে সঙ্কল্প।

বললেম: ইনিই মাধব বিদ্যারণ্য। এঁরই নাম কাল সন্ধ্যায় তোমাকে বলেছি। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বুদ্ধি বলেই এই বিরাট সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছে। সে গল্প তোমাকে আর এক সময় বলব। সঙ্গম নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের পাঁচ পুত্র ছিল। তাদের নাম হরিহর, কম্প, বুক্কা, মারপ্পা ও মুদাপ্পা। হরিহর ও বুক্কা ওরঙ্গলের অধিপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে ক্ষুদ্র সেনানায়ক ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের জীবনের উত্থান পতনের কথা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুরকে কর দেবার প্রতিশ্রুতি ও প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে একবার তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলুক শাহের আমলে তাঁর পুত্র জৌন খাঁ একবার ওরঙ্গল আক্রমণ করেন। সেবারে অর্থের বিনিময়ে সন্ধি হল না, সপরিবার প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন। ওরঙ্গলের

নাম হল সুলতানপুর। সেখানে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা হল।

প্রথম হরিহর ও প্রথম বুক্কার ছবি ছিল পাশাপাশি। তাঁদের পরিচয় দিয়ে বললেম: এঁরা তখন কয়েকজন অনুচর নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। হয়সালরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল সঙ্গমের আত্মীয় ছিলেন। তিনি এই আত্মীয় পুত্র হরিহরকে তাঁর আনেগুন্দির দুর্গ রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিলেন। এ বোধ হয় ৭৪২ সালের কথা। তুঙ্গভদ্রার তীরে বিদ্যানগর গড়ে ওঠে এই সময়েই। বছর দশেক পরে হয়সাল বংশ বিলুপ্ত হলে তিনি একজন স্বাধীন নায়ক বলে গণ্য হতে লাগলেন। ওরঙ্গলের পলাতক সৈন্যেরা তখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বেশ একটা শক্তিশালী সেনা কটক সৃষ্টি করেছে। পরের বছর দাক্ষিণাত্যে আর একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠে। পাগলা রাজা মহম্মদ বিন তুঘলুকের কুশাসনের সুযোগ নিয়ে হাসান নামে এক বিদ্রোহী রাজপুরুষ বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শুনলে আশ্চর্য হবে, হাসান প্রথম জীবনে দিল্লীতে গঙ্গু নামক এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় পদোন্নতি হয়েছে বলে নিজে নাম নিলেন আলাউদ্দীন বাহমন শা। আর বংশের নাম হল বাহমনী বংশ। কৃষ্ণার উত্তরে বেরার পর্যন্ত হল বাহমনীর অধিকার, রাজধানী গুলবর্গায়। কৃষ্ণার দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিজয়নগরের। শুধু রায়চুর দোয়াবের অধিকার নিয়ে বাহমনী ও বিজয়নগরে যে বিবাদ সৃষ্টি হল বুক্কার সময়ে, বাহমনী রাজ্যের দেড়শো বছরের ইতিহাসে তার অবসান হল না। মৃত্যুর দুবছর আগে বুক্কা চীনে তাঁর দুত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রাজা নাম গ্রহণ করেন নি।

ভাস্করকে পাশের চিত্রের সামনে টেনে আনলেম, বললেম: প্রকাশ্য ভাবে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন বুক্কার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় হরিহর। আমাকে এক আচার্য একবার বলেছিলেন যে দ্বিতীয় হরিহর বুক্কার পুত্র নয়, জামাতা, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাল্লাদেবীর

স্বামী। যেই হোন, তিনি যে পরাক্রান্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। দক্ষিণ ভারতের প্রায় শেষ পর্যন্ত মহীশূর কাঞ্চী ত্রিচিনপল্লীও নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। পারেন নি শুধু বাহমনী রাজাকে কাবু করতে।

পাশের চিত্রের সামনে দাঁড়ালেম তুজনে। বললেম : ইান প্রথম দেবরায়। দ্বিতীয় হরিহরের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার সাতাশ বৎসরের রাজত্বকালেই এঁর অগ্রজ দ্বিতীয় বুক্কা ও বিরূপাক্ষ গত হয়েছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস। প্রথম দেবরায় বেঁচে আছেন তার বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টার জন্য। সুলতান ফিরোজ শাহর কাছে পরাজিত হয়ে ইনি তাঁকে তাঁর কন্যাদান করেছিলেন। ভেবেছিলেন, অর্ধশতাব্দীর বিবাদ হয়তো মিটে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। কিছুকাল পরে হিন্দুরা ফিরোজকে পরাজিত করে তাদের অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

ভাস্করের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল পরের চিত্রখানির উপর। কী সৌম্য মূর্তি! বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তু চোখের দৃষ্টি। বললেম : চিত্রের মতো ইতিহাসেও ইনি জীবন্ত হয়ে আছেন। সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এই দ্বিতীয় দেবরায়। প্রথম দেবরায়ের পৌত্র ইনি। পুত্র বীর বিজয় বোধ হয় রাজত্ব করেন নি। বাহমনী সুলতানের সঙ্গে দ্বিতীয় দেবরায় একবার মল্ল যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর সন্ধি করেছিলেন তিনবার। বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহ যখন ওরঙ্গল অভিযান করবেন বলে স্থির করেন, দেবরায় তাঁকে অক্রমণ করে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের বিদ্রোহী ভ্রাতা আহমদ শাহ সুলতান হয়ে যখন আবার বিজয়নগর আক্রমণ করলেন, তখন তুর্ভিক্ষের জ্বালায় দক্ষিণ ভারত হাহাকার করছে। যুদ্ধে নেমেও দেবরায় সন্ধি করলেন, আর ওরঙ্গলের হিন্দু-রাজ্য চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেল। এই সন্ধি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। মাত্র দশ বৎসর পর দ্বিতীয় আলাউদ্দীন সুলতান হয়ে বিজয়নগর

আক্রমন করলেন। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে দেবরায় জেনেছেন যে তাঁর হিন্দু সেনা আর মুসলমান সেনার সঙ্গে এঁটে উঠবে না। তাদের অশ্বারোহী অনেক কর্মঠ, তাদের তীরন্দাজের সন্ধান অব্যর্থ। দেবরায় সন্ধি করলেন বটে, কিন্তু নিজ সেনাকে শিক্ষিত করবারও দায়িত্ব নিলেন। মুসলমান সৈন্যকে প্রলুব্ধ করবার জন্য তাদের জায়গীর দিলেন, তাদের উপাসনার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। আর সিংহাসনের সামনে রাখলেন পবিত্র কোরাণ। মুসলমান এই অপক্ষ-পাতে মুগ্ধ হল, হিন্দু শিখল তাদের রণ-কৌশল। আর একবার সন্ধি করেছিলেন দেবরায়। মুদকলের কাছে দু মাসে তিনটে যুদ্ধ হয়ে গেল। নিজের বীরপুত্র ভল্লের আঘাতে নিহত হলেন এই যুদ্ধে। সন্ধি করলেন ভ্রাতা প্রতাপ দেবরায়ের জন্য। কয়েক জন পদস্থ অমাত্যকে হত্যা করে রাজার মুণ্ডপাত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এই ভ্রাতা। দেবরায়ের চব্বিশ বৎসরের রাজত্বকালে চতুর্থবার সন্ধি করবার আর প্রয়োজন হয় নি।

ভাস্কর আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। থামতেই নিজের প্রশ্নটা জানিয়ে ফেললেন, বললেনঃ দেবরায়কে বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলবার কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে মাধব।

বললেমঃ যুদ্ধে জয় পরাজয় দিয়ে যদি শ্রেষ্ঠত্বের বিচার কর, তাহলে দেবরায়ের বিচার ঠিক হবে না। দেবরায়ের বিচার কর তাঁর শাসনপদ্ধতির সংস্কার দিয়ে, সাধারণ প্রজার জীবনের মান উন্নয়ন দিয়ে, শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারে ও দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি দিয়ে। তিনি মুসলমানের মসজিদ স্থাপনই করেন নি, করেছেন হিন্দুর দেবালয় নির্মাণ, জৈনদের জৈনমন্দির ও সকলের জন্য বিদ্যানিকেতন। কঙ্করময় প্রদেশকে কর্ষণ করিয়েছেন, ফলে ফুলে শোভিত করেছেন শুষ্ক প্রান্তর। আজ যে প্রস্তরের পয়ঃ প্রণালী বিজয়নগরকে সুজলা সুফলা করে রেখেছে, এ তাঁরই সময়ে নির্মিত। বিদেশের অর্থ এনেছেন দেশে বানিজ্য বিস্তার করে।

এঁরই সময়ে ইতালীয় পর্যটক নিকলো কন্টি ও সমরকন্দের রাজদূত আবত্নর রাজাক বিজয়নগর পরিদর্শন করে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা পড়ে মনে হয় যে সে সময় পৃথিবীতে এমন সমৃদ্ধ রাজ্য আর ছিল না। সম্পদে ও সৌভাগ্যে সুখী এমন প্রজা বুঝি ত্নুনিয়ায় কখনও ছিল না।

আমরা আর একখানি ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেম। সেখানি চন্দ্রগিরির শাসনকর্তা নরসিংহ শালুবের। বললেম: দ্বিতীয় দেবরায়ের জীবদ্দশাতেই ষড়যন্ত্র ও হত্যা শুরু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ভ্রাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যায় কলঙ্কিত হল সঙ্গম বংশ। দেবরায়ের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পর এই বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে বিজয়নগর অধিকার করলেন নরসিংহ শালুব। এই সব চরিত্রহীন অপদার্থ রাজাদের কোন চিত্র নেই রাজ সভায়। মনে হয়, একে অন্যের চিত্রকে নষ্ট করেছে।

রাজসভায় তখন পাত্র মিত্রের আগমন শুরু হয়েছে। গাম্ভীর্যে গম গম করছে সভাগৃহ। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেম। বললেম: ইনি বীর নরসিংহ। নরসিংহ শালুবের সেনাপতি-পুত্র। ক্ষণস্থায়ী শালুব বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনিই তুলুব বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভারত বিখ্যাত কৃষ্ণদেব রায়, যাঁর নাম ভারতের ইতিহাসে লেখা হয়েছে সোনার অক্ষরে।

অকস্মাৎ শৃঙ্গধ্বনি হল পিছনে। বললেম: মহারাজার আগমনের সময় হয়েছে। এই দেখে নাও, কৃষ্ণদেব রায়ের ভ্রাতা অচ্যুত দেব রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায়কে। পরে আমি এঁদের গল্প তোমাকে বলব।

আমরা নিজ নিজ আসন নেবার জন্য যখন অগ্রসর হয়েছি, দ্বার প্রান্ত থেকে দ্বারার ঘোষণা শোনা গেল: মহারাজা আসছেন।

বাহিরে নৌবতে তখন আশাবরী রাগিনীর আলাপ শুরু হয়েছে।

শ্রীখণ্ডশৈলশিখরে শিখিপুচ্ছবস্ত্রা

মাতংগমৌক্তিকমনোহরহারবল্লী।

আকৃষ্য চন্দনতরোরুরগং বহন্তী

সাসাবরী বলয়মুজ্জ্বলনীলকান্তি ॥

জলমধ্যস্থিত পর্বতে নায়কের প্রতীক্ষা করছেন আসাবরী। রাজসভায় আসন গ্রহণ করে আমরাও মহারাজের আগমনের অপেক্ষায় রইলেম রুদ্ধশ্বাসে।

॥ আট ॥

মহারাজ আসছেন! মহারাজ আসছেন!

চারিদিকে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠেই সভাস্থল স্তব্ধ হয়ে গেল। সিংহাসনের পিছনের প্রশস্ত দ্বারপথে আসা-সোঁটা-ছত্র-ব্যজনী-হস্তে-চোপদার ও ছত্রধারীরা এগিয়ে এল। সোনার আসা-সোঁটা ও কিংখাবের ছত্র ও ব্যজনী, তাতে মুক্তার ঝালর। কোষমুক্ত অসি হাতে প্রতিহারী ও পরিচারকবৃন্দ।

সসম্ভ্রমে আমরা উঠে দাঁড়ালেম।

মহারাজ এলেন।

সিংহাসনের পিছনে দাঁড়াল চোপদার ছত্রধারী ও প্রতিহারীরা। মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করলেন। মর্মর বেদীর উপর মনিমাণিক্য-খচিত সোনার সিংহাসন, তাতে সাত লহরী মুক্তার হার। সামনের পায়া দুটি যেন দুটো বাঘের মুখ, তাদের নীলকান্ত মণির চোখ জ্বল জ্বল করছে। মনে পড়ল, আবদুর রাজাক এই সিংহাসনের শিল্প নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভাস্করও মুগ্ধ হয়েছেন। ভাস্কর সিংহাসন দেখছেন, না মহারাজকে দেখছেন, বোঝা গেল না। মহারাজাও দেখবার মতো। এই রত্ন সিংহাসনে বসবার যোগ্য আভরণে ভূষিত তিনি। কিংখাবের পোষাকের উপর স্বুবর্ণ পরিকর, বামে বাঁধা তরবারি, কণ্ঠে হীরার হার। উষ্ণীষের হীরক খণ্ড থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে বারংবার।

রাজসভা দুভাগে বিভক্ত। দক্ষিণে বসেছেন পাত্র ও রাজ-পুরুষেরা। বামে মিত্র ও ব্রাহ্মণেরা। মধ্যে প্রশস্ত পথ, সীমন্ত রেখার মতো সিংহাসন থেকে সভার শেষ পর্যন্ত টানা।

ভাস্করের দিকে তাকালেম। তাঁর মহারাজা ও সিংহাসন দেখা শেষ হয়েছে। এবারে সভাগৃহ দেখছেন। সোনার পাতে মোড়া দেওয়াল। তাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত নানান চিত্র খোদিত। তৈলচিত্রের মাঝে মাঝে মানুষের জীবনের আলেখ্য এঁকেছে নিপুণ স্বর্ণকার। সোনার কিলক দিয়ে সোনার পাত আটকানো হয়েছে পাথরের প্রাচীরের সঙ্গে।

ছাদের দিকে চাইলেও মুখ নামানো যায়না। সোনার জলে সোনা হয়ে আছে বিচিত্র আলপনা। মেঝের দিকে চাইলেও মুখ তোলা যায়না। স্ফটিকের মতো রামধনুর রঙ লেগেছে মর্মরের উপর। ভাস্কর আজ হতবাক্।

পিছনের আসনগুলি শূন্য ছিল। দক্ষিণের প্রথম আসনগুলিও শূন্য। একজন অমাত্য আজ প্রধান মন্ত্রার কাজ করছেন। বড় বিব্রত দেখাচ্ছে তাঁকে। এত বড় দায়িত্ব কী করে বহন করবেন, সেই ভাবনাতেই অস্থিরতা প্রকাশ করে ফেলছেন।

মহারাজা সদাশিব রায়ের মনের ভাব আজ পড়া যাচ্ছে না। বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। না, রাজ সভায় এমনি গাম্ভীর্য নিয়ে রোজ বসেন! বেদীর নিচে বিজয়নগরের দূত অপেক্ষা করছিল। মহারাজা তাকে যুদ্ধের সংবাদ নিবেদন করবার আদেশ দিলেন। জানা গেল, আমাদের মাত্র একদিনের বিলম্বের জন্য তালিকোটের প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করা আর সম্ভব হল না। শত্রু সৈন্য ইতিমধ্যেই কৃষ্ণানদী অতিক্রম করেছে এবং আমাদের বিরাট বাহিনীর এগিয়ে যাবার সংবাদ পেয়ে রাক্ষস ও তঙ্গড়ী গ্রামে ছাউনি ফেলেছে! মনে হচ্ছে, আহমদনগরের সুলতান হুসেন নিজাম শাহ সেনাবাহিনীর মাঝখানে থেকে সৈন্য চালনা করবেন। আর দক্ষিণে বিজাপুরের আলি আদিল ও বামে বিদরের বারিদ শাহ ও গোলকুণ্ডার কুতব শাহ।

মহারাজা আমাদের শিবিরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে সংবাদও দূতের জানা ছিল। বলল: আমাদের মধ্যভাগে আছেন

রামরাজা, দক্ষিণে ভেঙ্কটাদ্রি ও বামে তিম্মরাজ। প্রথম সারিতে আমাদের এক সহস্র কামান, তার পশ্চাতে দুই সহস্র রণহস্তী।

মহারাজা আরও সংবাদের জন্য অপেক্ষমান দেখে দূত বলল: মুসলমানরাও প্রথম শ্রেণীতে তাদের কামান স্থাপন করেছে এবং মনে হচ্ছে, আমাদের একাদশ লক্ষের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করে এসেছে।

রামরাজা কী সংবাদ প্রেরণ করেছেন তাই জানতে চাইলেন মহারাজা সদাশিব রায়। দূত বলল: সে সুখবর মহারাজ। রামরাজা মনে করেন, শিশু যেমন ক্রীড়নক নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে, তেমনি উল্লাসের প্রত্যাশায় সুলতানেরা সমবেত হয়েছেন। আমাদের কামান থেকে অনল বর্ষণ শুরু হলেই প্রাণভয়ে তাঁরা রণে ভঙ্গ দেবেন।

তেমন নিশ্চিন্ত হবার মতো ভরসা দেখলেম না দূতের দৃষ্টিতে। ভাস্কর আমার মুখের পানে চেয়ে বোধ হয় সেই আশঙ্কাই নিঃশব্দে ব্যক্ত করলেন।

কিন্তু মহারাজা খুশী হলেন। বললেন: রামরাজা যখন নিজে সৈন্য চালনার ভার নিয়েছেন, আমি জানি, যুদ্ধের একটি অভিনয়ই হবে, যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না সুলতানরা। এও জানি যে এই সুযোগে রামরাজা কৃষ্ণার উত্তরেও রাজ্য বিস্তার করে আসবেন।

পুরস্কার দিয়ে দূতকে বিদায় দিয়ে মহারাজা এক রাজপুরুষকে আহ্বান করলেন। তিনি আসন থেকে নিচে গিয়ে মর্মর বেদীর নিকট দাঁড়িয়ে মহারাজের আজ্ঞার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নিম্নস্বরে ভাস্করকে বললেম: ইনি আমাদের রাজ-স্থপতি।

মহারাজা খানিকক্ষণ চিন্তা করে প্রশ্ন করলেন: ময় দানব কত সময়ে পাণ্ডবের সভা নির্মাণ করেছিলেন?

রাজপুরুষ চিন্তান্বিত হলেন।

রাজ-পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: চতুর্দশ মাসে।

মহারাজা সুখী হলেন। বললেন: আমি এক পক্ষ সময়

দিলেম। আজ দশ শত বাহাত্তর সালের আটই মাঘ, তালিকোটের যুদ্ধ বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে। বিজয়ী সেনা বিজয়নগরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আমি তাদের অভ্যর্থনার জন্য তার চেয়েও অপূর্ব একটি সভামণ্ডপ চাই।

রাজ-স্থপতি নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহারাজা বললেন: ময়-দানবের ত্রিশ গুণ স্থপতি নিয়োগ কর। তাহলেই চতুর্দশ দিনে সম্পূর্ণ হবে।

রাজ-স্থপতি তবু নিরুত্তর।

মহারাজা বললেন: সেই সভাটি পাঁচ হাজার হস্ত বিস্তীর্ণ ছিল বলে শুনেছি, তেমনি একটি উন্মুক্ত প্রান্তর নির্বাচন কর।

তারপর প্রশ্ন করলেন: মহাভারত পড়া আছে?

রাজ-স্থপতি শিরশ্চালন করে জানালেন: আছে।

মহারাজা সেই ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন: এঁকে যথাযথ উপদেশ দান করুন পণ্ডিত প্রবর।

ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: মহাভারতে সভাপর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের রাজধানী ও ঐ পর্বেরই একবিংশ অধ্যায়ে মগধাদির বর্ণনা আছে। এ ছাড়াও ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল একচত্বারিংশ সূক্ত পঞ্চম ঋক্ ও পঞ্চম মণ্ডল দ্বাষষ্ঠিতম সূক্ত ষষ্ঠ ঋকে সহস্র স্তম্ভ যুক্ত অট্টালিকার উল্লেখ আছে। রামায়ণের আদিকাণ্ড পঞ্চম সর্গে অযোধ্যার বর্ণনা ও সুন্দর কাণ্ড ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার বর্ণনাও পড়ে দেখো।

মহারাজা হৃষ্ট-চিত্তে রাজ-কবির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন, অনুরোধ জানালেন: আপনি পাণ্ডবের সভামণ্ডপের খানিকটা উৎকর্ষের কথা এঁকে শুনিয়ে দিন।

রাজ-পণ্ডিত খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন: আমিই এঁকে সেই উৎকর্ষের কথা শোনাচ্ছি মহারাজ।

বলে রাজ-স্থপতির দিকে চেয়ে বললেন: ইন্দ্রের সভাও এমন

অপরূপ দীপ্তিমতী ও মনোরম ছিল না। সভার মধ্যস্থলে যে সরোবর ছিল, তাতে মণির মৃণালে বৈদূর্যের পত্র ও কাঞ্চনের কহ্লার। স্ফটিকের সোপান শ্রেণীর ধারে সোনার মৎস কূর্ম, কেলি-রত বিহঙ্গম দেখেও রাজপুরুষদের ভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

মহারাজ অধীর হলেন, বললেন: আমি ঠিক এমনই চাই। পরাজিত সুলতানদেরও আমি নিমন্ত্রণ করে আনবো। তাদেরও যেন দুর্যোধনের মতো বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। কৃত্রিম সরোবর দেখে তাঁরা জল ভেবে কাপড় তুলবেন, আর শিলা জ্ঞানে প্রকৃত জলের ভিতর পড়ে হাবুডুবু খাবেন! বাহির হবার সময় প্রাচীরকে দ্বার ভেবে ধাক্কা খাবেন, আর দ্বারকে দেওয়াল ভেবে অযথা ঘুরে মরবেন।

আনন্দে উদ্ভাসিত হল মহারাজার প্রসন্ন বদন।

কিন্তু চিন্তান্বিত মুখে রাজ-স্থপতি আপন আসনে ফিরে এলেন।

মহারাজা নূতন অমাত্যের দিকে চাইলেন। তাঁর আদেশে দুজন বন্দী যবনকে রাজসভায় টেনে আনা হল।

ভাস্করকে আমি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেম।

অমাত্য ঘোষণা করলেন যে আজ প্রত্যুষে এই যবনেরা বন্দী হয়েছে। যিনি এই কার্যে প্রহরীদের সাহায্য করেছেন, মহারাজা তাঁকে সানন্দে পুরস্কৃত করবেন। তিনি সেই রাজভক্ত নাগরিককে যথাযথ প্রমাণ প্রদর্শন করে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

ভাস্করকে দেখলেম কেমন নির্জীব হয়ে গেছেন। আমি তাঁকে ঠেলে বেদীর দিকে পাঠিয়ে দিলেম।

অসাবধান পদক্ষেপে ভাস্কর যখন বেদীর নিচে দাঁড়িয়ে মহারাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, মনে হল, তাঁর সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়ে গেছে। নিজের পরিচয় গোপন করে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিবৃত করলেন।

আমি বন্দীদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান প্রহরীদ্বয়কে লক্ষ্য করছিলেম। তাদের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেখে খানিকটা চিন্তিত হলেম।

কিন্তু ভাস্কর সত্যই তাঁর সঙ্কল্প ভুলেছেন। উপসংহারে আমার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন: এই সেই ব্রাহ্মণ, যিনি এদের একটিকে বন্দী করে প্রহরীদের হাতে সমর্পণ করেছেন।

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেম না। আমার তো পুরস্কারের প্রয়োজন ছিল না। এত পরিশ্রম এত অধ্যবসায়ে যে কার্যসিদ্ধির জন্য এখানে আসা, এক নিমেষের দুর্বলতায় ভাস্কর তা নষ্ট করে দিলেন। আমি মর্মাহত হলেম।

মহারাজা আমাকে চেনেন, বললেন: মাধব বেদারণ্য!

বাধা দিয়ে বললেম: বেদারণ্য নয় মহারাজ, বিদ্যারত্ন।

দুঃখিত স্বরে মহারাজা বললেন: আপনাকে পুরস্কার দেবার জন্য আমি প্রস্তুত নই ব্রাহ্মণ, মুক্তার হার দিয়ে আপনার পাণ্ডিত্যের অবমাননা করব না।

অমাত্যকে আদেশ দিলেন রাত্রে নৃত্যগীতের উৎসবের জন্য। বললেন: সেই সঙ্গীত সভায় আপনার সম্বর্ধনা হবে।

ফেরার পথে ভাস্কর কোনও কথা কইলেন না।

॥ নয় ॥

আহারের পর বিশ্রামের সময় ভাস্কর প্রথম কথা কইলেন। মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন: তোমার প্রাপ্য পুরস্কারে আমার প্রয়োজন নেই মাধব, আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো।

আমি উত্তর দিলেম না।

ভাস্কর বললেন: আমি ক্ষত্রিয়, বীরত্বের পরিচয় দেবার সুযোগ আমার আসবে। কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করতে এমন অনুরোধ ক'রো না।

শীতের সূর্যকিরণে উত্তাপ নেই। আছে আলস্য। অশোক আর কিংশুকের শাখায় রক্তের ছোঁয়া লেগেছে। দাক্ষিণের বাতাসে ভেসে আসছে আম্র-মঞ্জুরীর মৃদুমন্দ সুগন্ধ। বসন্ত সমাগমের বিজ্ঞাপন দেখছি চারিদিকে।

আমাকে নির্লিপ্ত দেখে ভাস্কর তার প্রসঙ্গের বিষয় পরিবর্তন করে বললেন: মাধব বিদ্যারণ্যের গল্প শোনাতে চেয়েছিলে, তুমি কি ক্লান্ত এখন?

বললেম: ক্লান্ত নই, কিন্তু ইতিহাস কি এখন তোমার ভাল লাগবে?

ভাস্কর বললেন: ইতিহাস ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব কাহিনী। সে কথা শুনতে ভাল লাগে না, এমন ক্ষত্রিয় আছে বলে আমি জানি না।

বললেম: গল্পের মতো আবিশ্বাস্য এই রাজ্যের জন্ম কাহিনী। যে পরিত্যক্ত বিজয়নগরের উপর আজকের এই বিজয়নগর গড়ে উঠেছে, তার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিজয়ধ্বজ। তিনি ৫২৪ থেকে ৫৬২ সাল পর্যন্ত আনেগুন্দির রাজা ছিলেন। বালির সময়ে কিষ্কিন্ধ্যার

রাজধানী ছিল এই আনেগুন্দি। তখন অবশ্য এর কোন নাম ছিল না। য'দূর জানি, বাহ্লিক দেশের চন্দ্র বংশীয় নন্দ মহারাজ ৪২১ সাল থেকে বাষট্টি বছর আনেগুন্দির রাজা ছিলেন। চালুক্য মহারাজা বিজয়ধ্বজের পিতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজ্জল রায় কল্যাণপুরে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়ধ্বজ মধ্যম, বিষ্ণুবর্ধন কনিষ্ঠ। এই বংশের অষ্টম পুরুষ জম্বুকেশ্বর ৭৪২ সালে অপুত্রক পরলোক গমন করেন।

বাধা দিয়ে ভাস্কর বললেন: এই তোমার গল্পের মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা?

হেসে বললেম: সেই গল্পটুকুই এবারে বলব। এই সময় মাধব বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব হল বিজয়নগরে। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এক সময় হাম্পির ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে ঐশ্বর্যের প্রত্যাশায় তপস্যা করেছিলেন। তখন স্বপ্নাদেশ পান যে পরজন্মে তাঁর আশা সফল হবে। অবিলম্বে তিনি শৃঙ্গেরী মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিজয়নগর তাঁকে টানছিল। সেই অরাজকতার দিনে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য তিনি হাম্পিতে এসে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে আবার হত্যা দিলেন। চিন্ময়ী রূপে দেবী তাঁকে দর্শন দিলেন, বললেন: তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে। বিজয়নগরের শ্রীবৃদ্ধির ভার তাঁকেই নিতে হবে। ৭৪৩ সালে বিদ্যারণ্যের নামে বিদ্যানগর প্রতিষ্ঠা হল। দশ বৎসর পরে সঙ্গম বংশের হরিহরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে ব্রাহ্মণ তাঁর মন্ত্রী হলেন। নুনিজের লেখায় একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। একদা রাজা দেবরায় পরিত্যক্ত বিজয়নগরে এসেছেন মৃগয়ায়। অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। ছোট ছোট খরগোস তাঁর অনেক শিকারী কুকুরকে আক্রমণ করে মেরে ফেলছে। মাধবাচার্য তখন তুঙ্গভদ্রা তীরে তপস্যারত ছিলেন। তিনি সেই সংবাদ পেয়ে রাজাকে এই পরিত্যক্ত স্থানে রাজধানী স্থাপনের পরামর্শ দিলেন।

ভাস্কর বললেন : এই দেবরায় কে ?

বললেম : নরসিংহ দেবরায় এই বংশের পঞ্চম পুরুষ। তবে সুনিজের ঐতিহাসিক সত্য আমি খুঁজে পাই নি।

আমার গল্পের ভিতর বীরত্বের আস্বাদ না পেয়ে ভাস্কর হতাশ হয়েছিলেন। বললেন : তোমার এ গল্প নিতান্ত জ'লো মনে হল। বীরের কাহিনী যদি কিছু জানা থাকে তো তাই শোনাও।

বললেম : তবে তোমাকে মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের কাহিনী শোনাই। অপূর্ব তাঁর কাহিনী, ইতিহাসে তাঁর তুলনা নাই। এ শুধু আমার কথা নয়, এই কথা বলেছেন সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক পা-এস্ এবং এড্ওয়ার্ডো বারবোসা। তাঁর বিশ বৎসরের রাজত্বকালে শুধু যে অপরাজেয় ছিলেন তাই নয়, তাঁর মতো উদারচেতা সুশাসক ইতিহাসে কম। যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণ সেনানায়ক, শান্তির দিনে সুকবি ধর্মনিষ্ঠ প্রজাবৎসল রাজা। বিজাপুরের সুলতানের কাছে রায়চুর অধিকার করে উড়িষ্যা অভিযান করেন, জয় করেন উদয়গিরি ও কন্দবিদুর দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইস্মাইল আদিল শাহ যখন রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তখন তাঁর সেনা বাহিনী বিধ্বস্ত করে গুলবর্গার দুর্গ পর্যন্ত ধূলিসাৎ করে দেন। অথচ দেশে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতের সঙ্গে তেলগু সাহিত্যের বিকাশ হয়। বিখ্যাত অষ্টদিগ্গজ তাঁরই সভায় সভাসদ্ ছিলেন। আজ আমরা বিজয়নগর ও দক্ষিণ-ভারতের নানাস্থানে যে স্থাপত্য-কলা দেখে গর্বে ও গৌরবে মুগ্ধ হচ্ছি, তার প্রায় সমস্তই এই রাজার কীর্তি।

গভীর মনোযোগে ভাস্কর আমার গল্প শুনছিলেন। আমি উৎসাহ পেলেম, বললেম : কাল সন্ধ্যায় বিঠোবা বিঠল স্বামীর যে অপূর্ব মন্দির দেখলে, সেও এই রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের কীর্তি। যে বেদীর উপর মন্দির নির্মাণ হয়েছে, দিনের বেলায় সেই বেদীটি দেখো। দেখো মন্দিরের চারিপাশের উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি। পাথরের

যে রথটি দেখেছ মন্দির প্রাঙ্গণে, সেটি একটি পাথর কেটে তৈরি। পাথরের অক্ষদণ্ডের উপর পাথরের চাকা। উৎসবের দিনে বিঠল স্বামীর উৎসব মূর্তিকে এই রথের উপর স্থাপন করে মন্দির পরিক্রমা করানো হয়। স্থাপত্যের এমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চব্বিশ হাত উঁচু নরসিংহের মূর্তি দেখেছ তো? সেটিও একটি পাথর থেকে কেটে বার করা। রাজ প্রাসাদের ভিতর রাজসভা আজ দেখলে, নাট্যশালাও দেখতে পাবে আজ রাতে। যা দেখতে পাবে না, সে হচ্ছে মহিষীদের মহল ও তাঁদের স্নানের জায়গা। এ রাজ্যের হাতিশালাও দেখবার মতো। সমস্তই তাঁর কীর্তি।

বললেম: কৃষ্ণদেব রায়ের সময় বিজয়নগর নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করেছে। ভাটকল বন্দর থেকে ভারতের হীরা মুক্তা ঔষধি ও গন্ধদ্রব্য গেছে বিদেশে, আর বিদেশী বণিক এসে ভারতে বাণিজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেছে। পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলমিদাও এসেছিলেন বিজয়নগরে, তার প্রধান বন্দর ভাটকলে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি চাইতে। কিন্তু মহারাজা তাদের দুর্ব্যবহার দেখেছেন কালিকটের রাজা জামোরিন ও আরব বণিকদের সঙ্গে। আলমিদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরবর্তী শাসনকর্তা আলবুকার্ক ছিলেন সুচতুর। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আনুকুল্য পেয়েছিলেন।

অষ্টদিগ্‌গজের কোন এক দিগ্‌গজের লেখা রাজপ্রশস্তি গ্রন্থের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ভাস্করকে প্রশ্ন করলেম, সে বই সে পড়েছে কিনা। দ্বিধা না করে ভাস্কর পড়েন নি বললেন।

আমার মনে পড়ল কৃষ্ণদেব রায়ের শেষ জীবনের কথা। মৃত্যুর বছর আট নয় আগের ঘটনা। তখন তিনি বলদৃপ্ত গর্বিত মহারাজা। রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধারের জন্য বিজাপুরের আদিল শাহ কৃষ্ণার উত্তর তীরে পট্টাবাস স্থাপন করেছেন। সঙ্গে একলক্ষ চল্লিশ হাজার

পদাতিক ও অশ্বারোহী। কৃষ্ণদেব রায় যখন দূত মুখে এ সংবাদ শুনলেন, তিনি সাত লক্ষ ছত্রিশ হাজার সেনা, তেত্রিশ হাজার চারশো অশ্ব ও পাঁচশো পঞ্চাশটি হাতি নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। বিজয়-নগরের রাজপথ কম্পিত হল জগঝম্প ঢক্কা তাসা কাড়া ও দামামার শব্দে।

এই যুদ্ধের বিবরণ পড়েছি রাজপ্রশস্তিতে। ভাস্করকে সেই গল্প বললেম: কৃষ্ণার তীরে বিজয়নগরের যে ছাউনি পড়ল, তাকে একটি জনপদ বলা চলে। সাত লক্ষ সত্তর হাজার সেনার পট্টাবাস। আহার্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করে গেছে কয়েক সহস্র গর্দভ ও অশ্বতর। তাদেরও আহার্য চাই, আহার্য চাই হস্তী ও অশ্বের। ব্রাহ্মণেরা গেছেন বিজয়নগরপতির গৃহ দেবতা নিয়ে, বৈশ্যরা গেছে জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ নিয়ে। ভৃত্য গেছে, রজক নাপিত গেছে। ছদ্মবেশে শঠও গেছে আপন আপন কর্মের জন্য। এত লোক নিয়ে যে ছাউনি তাকে নগর বলব না?

একাদশ ভাগে বিভক্ত হয়ে বসেছে সেনাবাহিনী। প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন সেনানায়ক। তাদের আলাদা বাজার, আলাদা ব্যবস্থা। কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা বিরাট ছাউনির একস্থানে গৃহ দেবতার প্রতিষ্ঠা হল। তার নিকটে রাজা ও তাঁর প্রধান কর্মচারীগণের বাসস্থান, তাতে খোজা প্রহরীর সর্বক্ষণের প্রহরা। এই স্থানটি বেষ্টন করে রইল সামরিক প্রহরীরা। ভৃত্যেরা স্থান পেল এদের সঙ্গে। এই সবের সামনে আপন আপন সেনা পরিবৃত হয়ে রইলেন সেনা নায়কেরা। তাদেরও ছাড়িয়ে রইল গুপ্তচরেরা। কাঁটার বেড়ায় যে প্রবেশ পথ, তাতে সৈন্যদের সারাক্ষণের কঠিন প্রহরা।

ছাউনির ভিতর বহু বিস্তৃত পথ। তার দুধারে বাজার। বস্ত্র বিক্রেতা বসেছে নানা বর্ণের বস্ত্র নিয়ে, মণিকারও তার পসরা সাজিয়ে বসেছে। বস্ত্রের মতো রত্নাভরণও যে সাধারণ লোকের ব্যবহার্য এই বিজয়নগরে।

প্রথমে পরাজয় হচ্ছিল হিন্দু সেনার। শেষে মহারাজা কৃষ্ণদেব রায় যখন স্বয়ং নেতৃত্ব নিলেন সেনাবাহিনীর, হিন্দুর জয় হল! রণক্ষেত্রে মহারাজের বীরত্বের কাহিনী পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়।

মুসলমান সেনা ছত্র ভঙ্গ হল। কতক ডুবে মরল কৃষ্ণার তীব্র স্রোতে, বাকি সকলে হিন্দু সেনার হাতে প্রাণ হারাল। সুলতান আদিল শাহ সাতটি মাত্র অনুচর নিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন।

মহারাজা যখন রায়চুর দুর্গে প্রবেশ করলেন, মুসলমান দুর্গ রক্ষীরা প্রাণ ভয়ে আত্মগোপন করেছিল। ভেবেছিল, দুর্গ রক্ষার দাম দিতে হবে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণদেব রায় পরাজিত শত্রুর অসম্মান কখনও করেননি। বন্দী করে এনেও প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন শত্রুকে। এবারেও কেউ তাঁর অপরিসীম ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হল না। রক্ষীদেরও ক্ষমা করলেন মহারাজা।

দেশে ফিরে বিজয়ের যে উৎসব করলেন, তাতেই তাঁর অহঙ্কার প্রথম ধরা পড়ল। নিমন্ত্রিত হয়ে যে সুলতানেরা এসেছিলেন, মহারাজা তাঁদের আপ্যায়িত করলেন না। সভায় দিলেন না আসন, রাজপথে অশ্বারোহণের অনুমতিও দিলেন না। উৎসব ক্ষেত্রে মহারাজা বিষবৃক্ষ রোপণ করলেন।

এর পর আজ পঁয়তাল্লিশ বছর গত হয়েছে। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর রাজত্ব করেছেন তাঁর ভ্রাতা অচ্যুত রায়। আজকের মহারাজা সদাশিব রায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। লোকে বলে, এঁরা শুধু নামেই রাজা, দেশের প্রকৃত রাজা এখন মন্ত্রী রামরাজা, যিনি আশী বৎসর বয়সে যুদ্ধের সেনাপতিত্ব করবার জন্য গেছেন তালিকোটের যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভাস্কর অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন। বুঝতে পারছি, এ সব কথা তাঁর আর ভাল লাগছে না। আমাকে দম নিতে দেখেই ভাস্কর প্রসঙ্গের মোড় ফেরালেন। বললেন: একটা জিনিস আজ

বড় আশ্চর্য লেগেছে। যবনের গুপ্তচরেরা কী উদ্দেশ্যে রাজপ্রসাদে প্রবেশ করেছিল, তার কোনও খবর পেয়েছ কি?

বললেম: বিশ্বাসযোগ্য খবর না পেলেও রাজঅন্তঃপুরের কানাঘুষো শুনেছি।

ভাস্কর উদগ্রীব হলেন।

বললেম: রাজকন্যা গায়ত্রীর সংবাদ জানবার কিছু প্রয়োজন ছিল কোনও যবন সুলতানের। এর ভিতর যে কোনও রাজনৈতিক কারণ নেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন মহারাজ সদাশিব রায়।

আরও বিস্মিত হলেন ভাস্কর, বললেন: রাজকন্যা গায়ত্রীর সংবাদের প্রয়োজন হল কোনও সুলতানের?

বললেম: কেন হবে না? রাজকন্যার রূপের খ্যাতি আছে এ তল্লাটে। বিজয়নগর লুণ্ঠনের যদি কোন সুযোগ আসে সুলতানদের, রাজকন্যা কার ভাগে পড়বেন, তা নিশ্চয়ই স্থির আছে। তিনি কি এমন রত্ন হাতছাড়া হতে দিতে পারেন?

ভাস্কর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন: সাবাস্ ব্রাহ্মণ! এমন বুদ্ধি না হলে কি আর ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয়েছে তোমার!

বললেম: কিন্তু উল্লসিত হবার এ সময় নয় বন্ধু, বিজয়নগরের দুর্দিন দেখছি আমি। সকাল বেলায় দূতের মুখের ভাব কি লক্ষ কর নি? প্রত্যক্ষদর্শীর মনেও আজ সংশয় জেগেছে।

ভাস্কর বললেন: একথা কেন ভাবছ?

বললেম: বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আজ বীরের অভাব হয়েছে বিজয়নগরে।

ভাস্কর কিছু ক্ষুব্ধ হলেন আমার এই মন্তব্যে। বললেন: তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর?

বললেম: যে রাজ্যের নারীরা আর নিশ্চিন্ত নয়, অনিশ্চিতের আশংকা যে রাজ্যের নারীদের নিয়ত নিপীড়িত করছে, সে রাজ্যে বীরের অভাব হয়েছে, এ কথা সঙ্গত ভাবেই মনে করতে হবে।

বিস্মিত হয়ে ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: তুমি কি তাই দেখে এলে আজ রাজ অন্তঃপুরে?

রাজকন্যার স্বপ্নের কথা তাকে খুলে বললেম।

ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে শুনলেন।

বললেম: যে কথা রাজকন্যা আজ মুখ ফুটে বলতে পারলেন না, সে কথাও যেন আমি শুনতে পেয়েছি।

ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে ভাস্কর আমার মুখের দিলে চাইলেন।

বললেম: যে দেবতার পূজার নৈবেদ্য তিনি নিজে, তাঁর সাক্ষাৎ বুঝি আজও তিনি পান নি। শৃগাল শকুনি বেষ্টিত হয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি সেই দেবতার প্রতীক্ষা করছেন।

ভাস্কর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

শীতের বাতাস এসে লাগছে অশোক আর কিংশুকের পাতায়। আন্দোলন জাগছে মৃদু মৃদু। মধু লোভে ভ্রমর গুঞ্জন করছে আম্র মঞ্জরীর চারি পাশে। টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে এক আধটা মঞ্জরী। শীতের রৌদ্রে আজ উত্তাপ নেই।

॥ দশ ॥

সন্ধ্যারতির পর কুটীরে না ফিরে আমরা মহারাজার নাট্যশালায় এলেম। এখানে আজ আমরা নিমন্ত্রিত, রাজপুরুষেরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে আমাদের আসন নির্দেশ করে দিলেন।

আমরা নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করলেম।

সম্মুখে মর্মর বেদীর উপর মহারাজার গজদন্তের সিংহাসন এখন শূন্য।

অদূরে নৃত্যগীতের মর্মর মঞ্চের উপর কিংখাবের মসলন্দ। বাদকেরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছেন বৃত্তাকারে। নর্তকী মাঝখানে বসে মহারাজার অপেক্ষা করছেন। সুগন্ধ আতরে :চারিধার আমোদিত হয়ে আছে।

ভাস্কর কক্ষের শোভা দেখছিলেন। অপূর্ব এই কক্ষের স্তম্ভগুলি, নৃত্যের নানা ভঙ্গি উৎকীর্ণ করা আছে স্তম্ভগাত্রে। দেওয়ালের পাথরেও নানাচিত্র ক্ষোদিত। স্ফটিকের দীপাধার থেকে আলোক বিকীর্ণ হয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সেই চিত্রগুলি।

বললেম : এর সবগুলিই মানুষের জীবনালেখ্য নয়। সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের উৎপত্তির কাহিনীও ধরা পড়েছে শিল্পীর হাতে।

ভাস্কর নিঃশব্দে সব দেখছেন।

বললেম : ঐ চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ?

বলে অঙ্গুলি নির্দেশে একখানি চিত্র দেখালেম।

ভাস্কর বললেন : যে চিত্রটি নাট্যশালার মতো দেখাচ্ছে, সেটির কথাই বলছ কি?

বললেম : ঠিক তাই। তার আগের চিত্রগুলি লক্ষ্য করে দেখ। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে কী অনুরোধ করছেন, তারপর ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা ঐ নাট্যশালা নির্মাণ করলেন। মহর্ষি ভরত নিয়েছেন এই নাট্যশালা পরিচালনার ভার। শিব ও পার্বতীকে দেখ, নৃত্যকলার শিক্ষা দিচ্ছেন।

অকস্মাৎ শৃঙ্গধ্বনি এল দ্বার প্রান্ত থেকে। মৃদু গুঞ্জন উঠল : মহারাজ আসছেন, মহারাজ আসছেন।

স্ফটিক স্তম্ভের উপর নাট্যশালার তোরণ। তার গায়ে গজদন্তের পুষ্প স্তবক। সেই দ্বার দিয়ে এলেন মহারাজা। এবারে ছত্রধারী প্রতিহারীরা এল না আগে পিছনে, মহারাজা এলেন নারীদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে।

জয়ধ্বনি উঠল নাট্যশালায়।

স্খলিত পদে মহারাজা বেদীর উপর উঠলেন। দেহ এলিয়ে দিলেন সিংহাসনের গায়ে।

বাদকেরা তাদের যন্ত্র হাতে তুলে নিল। কিন্তু আলাপ শুরু করবার আগেই বাধা পড়ল। মহারাজা চারিদিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেই হুঙ্কার দিলেন রাজপুরুষদের : আজ আলো নেই কেন নাট্যশালায় ?

আমরাও তাকালেম চারিদিকে।

স্ফটিকের দীপাধার থেকে যেন সূর্য কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। দ্বিতলের অলিন্দগুলিও উদ্ভাসিত দেখাচ্ছে সেই আলোকে। সূক্ষ্ম কারুকার্য করা প্রস্তরময় বাতায়ন পথে অন্তরালবর্তিনীদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

স্তব্ধ হয়ে আছেন রাজপুরুষেরা।

মহারাজা আবার হাঁকলেন : জ্বাল, জ্বেলে দাও সমস্ত বাতি।

নর্তকী উঠে দাঁড়িয়েছিল। রুক্ষস্বরে মহারাজা তাকে বসতে বললেন : কে তোমার নৃত্য দেখবে অন্ধকারে বসে ?

রাজপুরুষদের মুখে কথা নেই।

গায়ক বিনায়ক রাওকে আহ্বান করলেন মহারাজা। বললেন: দীপক গাও বিনায়ক, দীপক গাও! জ্বালিয়ে তোল এই নেবানো বাতিগুলো।

বিনায়ক রাও এগিয়ে আসছিলেন, আবার বসে পড়লেন। এই দীপক শোনবার শখ হয়েছিল গীত-রসিক দিল্লীর বাদশাহর। প্রাণ দিতে হল গায়ক গোপাল নায়ককে। যমুনার জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে গোপাল দীপকের আলাপ করেছিলেন, তবু তার দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

কই, সুরা কই?

মহারাজা নারীদের প্রশ্ন করলেন।

স্ফটিকের পাত্রে একজন সুরা এগিয়ে দিল। বিকৃত মুখে মহারাজা তা পান করলেন। বললেন: আজ পিছনে রইলে কেন বিনায়ক, এগিয়ে এস। এই অন্ধকার স্তব্ধ ঘরখানাকে জাগিয়ে তোল।

বিনায়ক রাও আবার উঠলেন। অনেক দ্বিধায় এগিয়ে এলেন মহারাজার সামনে। যুক্তকরে নিবেদন করলেন: মহারাজ, দীপক গ্রীষ্মের রাগ, গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আপনাকে দীপক শোনাব। তার চেয়ে আজ শ্রীরাগের আলাপ করি। অনেকক্ষণ আগেই সূর্যাস্ত হয়েছে জানি। দেখা যাক্, তার বর্ণ-বিভা কতক্ষণ ধরে রাখা যায়।

চুপি চুপি ভাস্করকে আমি গানের কথা বললেম: ষড় ঋতুতে ষড় রাগের আলাপ হয় বিজয়নগরে। গ্রীষ্মে সভার্য ভৈরব, বর্ষায় সদার মেঘ, শরতে সস্ত্রীক পঞ্চম, হেমন্তে সভার্যক নট নারায়ণ, শীতে সবধূ শ্রীরাগ ও বসন্তে সপত্নীক বসন্ত।

মহারাজা ব্যস্ত হয়েছিলেন, বললেন: কিছু একটা কর।

শ্রীরাগের বন্দনা করলেন বিনায়ক রাও।

অষ্টাদশাব্দঃ স্মরচ্চারুমূর্তিঃ।

ধীরো লসৎপল্লবকর্ণপুরঃ ॥

ষড়্‌জাদিসেব্যোহরুণবস্ত্রধারী

শ্রীরাগ এষঃ ক্ষিতিপালমূর্তিঃ ॥

সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীরাগ নায়িকা পরিবৃত হয়ে নানা রঙ্গের নৃত্যগীত শুনছেন।

তারপর আলাপ শুরু করলেন। গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। মনে হল, নৈশ নীরবতায় শুধু নাট্যশালা নয়, গোটা জগৎটাই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ছে।

অস্থির হলেন মহারাজা, বললেনঃ অন্ধকারকে আর বাড়িয়োনা বিনায়ক, বন্ধ কর তোমার গান।

বিনায়ক রাও স্তব্ধ হলেন।

মহারাজা আরও খানিকটা সুরা গলাধঃকরণ করে বললেনঃ আমি আলো চাই, আনন্দ চাই, তুমি হিন্দোল গাও।

হিন্দোল যে প্রাতঃকালের সংগীত মহারাজ!

করজোড়ে নিবেদন করলেন বিনায়ক।

উঃ অসহ্যঃ মহারাজা ধৈর্য হারালেনঃ তোমার ব্যাকরণ শুনতে আর পারি না।

বলে নর্তকীদের দিকে চেয়ে নির্দেশ দিলেনঃ তোমরাই তাহলে শুরু কর।

বিনায়ক রাও মাথা হেঁট করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

মন্দিরের নাটমণ্ডপে দেবদাসীর নৃত্যে আমার অরুচি নেই। সেই পবিত্র পরিবেশের ভিতর দেবতার উদ্দেশে যা কিছু আনন্দ বা উৎসবের আয়োজন, গঙ্গোদকের মতো তাকেও আমার পবিত্র মনে হয়। কিন্তু সাধারণ নাট্যশালায় নট নটীর নৃত্যলাস্যে উৎসাহ পাইনে। ভাস্করকে চুপি চুপি সে কথা জানালেম।

ততক্ষণে যন্ত্রীদের যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে নর্তকীর লাস্য নৃত্য শুরু হয়ে গেছে।

ভাস্কর তেমনি ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেনঃ যৌবত নৃত্যেই তোমার এমন আপত্তি, ছুরিত নৃত্য তাহলে তোমার অসহ্য বল ?

যাত্রাভিনয়নৈর্ভাবরসৈরশ্লেষ চুম্বনৈঃ।
নায়িকা নায়কৌ রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতং কি তৎ ॥

লাস্য নৃত্যে এই দুই নৃত্যই প্রধান। বললেমঃ নর্তকী একা যা ইচ্ছা করুক, কিন্তু নর্তকের সঙ্গে একত্র হয়ে নানা রঙ্গ করবে, সে সত্যই অসহ্য নয় কি ?

ভাস্কর হেসে বললেনঃ শুনেছি কৈলাস শিখরে শিব ও পার্বতী ছুরিত নৃত্য করে থাকেন।

বলে মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন।

বললেমঃ তাঁদের তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যকে ছুরিত নৃত্য ব'লো না। সেই নৃত্য থেকেই তো তালের জন্ম হয়েছে। তাণ্ডবের তা ও লাস্যের লা আজকের একতালা, তেতালা ও চৌতালায় এখনও বর্তমান আছে।

নিবিষ্ট চিত্তে ভাস্কর নৃত্য দেখতে লাগলেন। আমার চিত্ত সেদিকে গেল না। যে মানুষের উপর প্রজার সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাঁকে এমন মোহগ্রস্থ দেখে মন ভরে ওঠে না। রাজা তারাপীরের কথা মনে পড়ল। তাঁর মস্তক প্রায়ই অলক্ত রঞ্জিত দেখা যেত। কাদম্বরীতে কবি বাণ লিখেছেনঃ

কদাচিদ্বকুলতরুরিব কামিনী-গণ্ডূষ-
সীধুধারাস্বাদমুদিতো বিকাশমভজত।
কদাচিদশোক পাদপ ইব যুবতি-চরণ-তল-
প্রহার-সংক্রান্তালক্তকরসো রাগমুবাহ ॥

বকুল যেমন কামিনীর মুখাসবে মুকুলিত হয়, অশোক যেমন যুবতী-চরণাঘাতে অলক্ত রঞ্জিত হয়, তেমনি রাজারও কামিনীর মুখাসব ও চরণাঘাতের প্রয়োজন।

মনে হল, এর চেয়ে মুক্তার হার ছিল ভাল। গলায় না হয় নাই পরতেম সে হার।

এই নাচ ভাস্করের ভাল লাগছে দেখলেম, কিন্তু মহারাজার ভাল লাগল না। তাঁর আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। এবারে বিরক্ত স্বরে নৃত্য বন্ধ করবার আদেশ দিলেন।

নূতন অমাত্যকে ডেকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : আমার রাজকার্যের কী যেন বাকি ছিল অমাত্য ?

অমাত্য স্মরণ করিয়ে দিলেন : পণ্ডিত মাধব বিদ্যারত্নের পুরস্কার ঘোষণা এখনও বাকি আছে।

সকালের ঘটনা মহারাজার মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলেন : ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন সভায় ?

অমাত্য সমর্থন জানালেন। ইঙ্গিতে আমাকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন।

আমি মহারাজার সামনে এসে তাঁকে সম্মান জানালেম।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে মহারাজা বললেন : মতঙ্গ পর্বতে পরশুরামের মন্দিরের নিকটে আমি যে নূতন বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করছি, আমি আপনাকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেম। এই কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য আপনাকে এই কয়খানি গ্রামের অধিকার দেওয়া হল।

অমাত্যের প্রসারিত হস্তে কিছু দলিল পত্র ছিল। তিনি তা গ্রহণ করে আমার হাতে দিলেন। বিনীতভাবে আমি তা গ্রহণ করলেম।

মহারাজা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন : আমি আজ বড় অস্থিরতা বোধ করছি অমাত্য, কোনও গভীর দুর্যোগের আশঙ্কায় মন এমন অশান্ত হয়েছে বলে অনুমান করছি।

দুর্যোগ কিসের মহারাজ ?

অমাত্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

সভা আজ ভেঙ্গে দাও।

বলে মহারাজা সিংহাসন থেকে উঠবার চেষ্টা করলেন। নারীরা তাঁকে সাহায্য করল। স্খলিত চরণে মহারাজা নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তাঁর যাবার আগে আমি ভাস্করকে এক গল্প শোনালেম। বললেম : আজ আমার আর একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। যুদ্ধ শিবিরের ভিতর মহারাজা দেবরায়ের রঙ্গশালা। সম্মুখ সমরে বীর দেবরায়কে পরাস্ত করতে না পেরে দিল্লীর সুলতান গোপনে তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে হত্যা করবার ব্যবস্থা করেছেন। এই ভার নিয়ে সবান্ধব সারানজী নামে জনৈক কাজী ফকিরের বেশে শিবিরে প্রবেশ করেন ও নটীর বেশে শিবিরের রঙ্গশালায় আসেন।

ভাস্কর কৌতূহলী হলেন।

বললেম : কাজী এক নর্তকীর সঙ্গে প্রণয়ের ভাণ করে। এবং রাজ সমীপে তার নৃত্য দেখবার জন্য পা জড়িয়ে সাধ্য সাধনা করে। বাদক ভিন্ন অন্য পুরুষের সে সভায় যাবার অনুমতি নেই। কাজেই কাজীকেও স্ত্রী বেশ ধারণ করতে হয়। দেবরায় উপস্থিত ছিলেন না, সবান্ধবে ছিল তাঁর পুত্র। কাজী তার তরবারির খেলা দেখাবার সময় বাতি নিবিয়ে দিয়ে রাজকুমার ও আরও অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

সেদিনের মতো আজও উৎসব জমল না।

॥ এগার ॥

কিন্তু মহারাজার মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন ভাস্কর। নাট্যশালা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় আমাকে তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: কিন্তু একটা কথা ভেবে আমার মনে বিস্ময় জাগছে।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার নিঃশব্দ প্রশ্ন চোখের দৃষ্টিতে ব্যক্ত করলেম।

ভাস্কর বললেন: সুরাপানে মহারাজার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছিল, তা না হলে নাট্যশালা অন্ধকার বলে অমন অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না।

বললেম: সুরার মাত্রাধিক্য হলে বুদ্ধির বিভ্রম ঘটবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভাস্কর বললেন: আমি সেই কথা সত্য বলে ধরে নিয়েছি বলেই বিস্মিত হচ্ছি মহারাজার শেষের আচরণে। তোমার পুরস্কার ঘোষণার সময় তাঁর এতটুকু মত্ততা প্রকাশ পেল না। সে কি আশ্চর্যের নয় মাধব?

বললেম: আশ্চর্যের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু অসম্ভবও নয়। শুনেছি সুরায় সংজ্ঞা হারিয়েও লক্ষ্যবেধ করেছেন ক্ষত্রিয় ধনুর্ধর। সে যদি সম্ভব হয়—

ভাস্কর বাধা দিলেন আমাকে, গতিরোধ করে বললেন: গুরুদেব বলে কে যেন ডাকলেন মনে হল।

আমাদের বামে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা শ্বেত মর্মরের যবনিকা। তার আড়ালে থেকে অন্তরালবর্তিনীরা আমাদের দেখেন, আমরা তাঁদের দেখতে পাই না। নিজেদের কর্তব্য স্থির করে উঠবার আগেই

দুজন প্রতিহারিণীকে দেখতে পেলেম দরজার পাশে। অত্যন্ত নম্র স্বরে বলল ঃ রাজকুমারী!

আমরা পথ ছেড়ে পাশের অলিন্দে প্রবেশ করলেম। সেখানে রাজকন্যা গায়ত্রী আমার অপেক্ষা করছিলেন। বললেন ঃ আমাকে প্রণাম করবার অনুমতি দিন গুরুদেব।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই রাজকন্যা নত হয়ে প্রণাম করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আপনার সম্মানে আমি সুখী হয়েছি গুরুদেব।

আমি তাঁকে আশীর্বাদ করলেম।

কিন্তু একি, ভাস্কর কেন অমন করে তাকিয়ে আছেন? সহজ সৌজন্যবোধ কি তিনি ভুলে গেলেন? রাজকন্যা লজ্জায় তাঁর চোখ নামিয়ে নিলেন।

ভাস্করকে একটু নাড়া দিয়ে সজাগ করে দিলেম। বললেম ঃ ভাস্কর, ইনিই আমার শিষ্যা রাজকুমারী গায়ত্রী দেবী।

ভাস্কর নমস্কার করলেন।

রাজকন্যার দিকে চেয়ে বললেম ঃ আর ইনি আমার বাল্যবন্ধু ভাস্কর দেব, দেবগিরির রাজ্যহীন রাজকুমার।

রাজকন্যা প্রতিনমস্কার করলেন।

কথা বললেন না কেউ।

রাজকন্যাকে আর একবার আশীর্বাদ করে আমরা অলিন্দের বাহিরে বেরিয়ে এলেম। নাট্যশালার অতিথিরা তখনও চলেছেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে চলতে লাগলেম।

উন্মুক্ত আলোকিত পথ দিয়ে আমরা ফিরে আসছি। ভাস্করের মুখে আজ কথা নেই। আমি তাঁর আচরণের কথাই ভাবতে লাগলেম। সৌজন্য ও শিষ্টাচার যাঁর জন্মগত শিক্ষা, রাজকন্যার

সামনে তাঁর ব্যবহার অমন বিসদৃশ লাগল কেন? একটুখানি মিষ্টি হেসেও কি খানিকটা সম্মান প্রদর্শন করতে পারতেন না!

আর রাজকন্যা! সত্যিই তাঁকে আজ অনির্বচনীয় দেখাচ্ছিল। তাঁর তনু দেহকে লতার মতো জড়িয়ে উঠেছিল একখানি শাদা রেশমের শাড়ি। স্নিগ্ধ আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। মুখে প্রসাধন দেখলেম না, দেখলেম প্রশান্তি। হীরা মুক্তার ইন্দ্রধনুচ্ছটার মধ্যে অশ্রুবিন্দুর মতো পবিত্র দেখলেম রাজকন্যাকে। তিনিও ভুলে গেলেন সাধারণ শিষ্টাচার রক্ষার কথা।

আরও খানিকটা পথ নিঃশব্দে অতিক্রম করে প্রশ্ন করলেম: কী ভাবছ ভাস্কর?

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন: সেইটেই ভেবে পাচ্ছি নে।

বললেম: তোমার পায়ের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পাচ্ছি যে তোমার মন আজ চলার দিকে নেই। শান্ত আজ্ঞাবহের মতো তোমার পা দুখানা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছে মাত্র।

ভাস্কর হেসে বললেন: মনটা নিজের পায়ে দেবার চেয়ে যোগ্যতর পা আজ দেখছি।

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেম।

ভাস্কর এবারে স্পষ্ট করে হাসলেন, বললেন: ভয় পেলে নাকি ব্রাহ্মণ?

এক নিঃশ্বাসেই যোগ করলেন: তোমার শাস্ত্রে বুঝি এসব রসিকতার স্থান নেই?

আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বললেন: আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো মাধব। তোমার শিষ্যাকে আমি অপমান করতে চাই নে। অপমান কেন করব? দুঃখ দিয়ে যে শুধু দুঃখই পাওয়া যায়। দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে আমার লাভ কী বল?

ভাস্কর আবার হাসলেন, অপ্রকৃতিস্থের মতো অর্থহীন হাসি।

॥ বারো ॥

সকাল বেলাটা কুটীর সংলগ্ন উদ্যানে অলসভাবে বসে কাটাতে ভাস্কর কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন: শীতের এমন সুন্দর সকাল তুমি আমায় ঘরে বসে কাটাতে বল?

বললেম: একটুখানি ছুটি দাও আমায়। আমি আমার অধ্যাপনার কাজটুকু শেষ করেই পালিয়ে আসব। তারপর তোমার সঙ্গে যাব মতঙ্গ পর্বতে। সেখানে আজ আমার অনেক কাজ।

ভাস্কর হেসে বললেন: আমাকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরতে তোমার আপত্তি কেন? আমি তো রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাবার প্রার্থনা জানাই নি!

বললেম: তবে চল, দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু বাধা পেলেম। একজন বৃদ্ধাকে দেখলেম, লাঠি ঠুকে ঠুকে অতি সন্তর্পণে আমার আশ্রমে প্রবেশ করছে।

কাছে এসে প্রণিপাত করল। চারিদিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বুকের ভিতর থেকে বার করল একখণ্ড শুকনো ভূর্জপত্র। লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আনবার জন্য এমন নিশ্চিন্ত স্থান বুঝি আর নেই। ভূর্জপত্র না হয়ে সে যদি মনের পাতা হত, তাহলে সে আরও গোপন হত। কিন্তু তা পড়বার জন্য আর একটা মনের প্রয়োজন হত একই সুরে বাঁধা।

পত্রখানি আমার হাতে না দিয়ে দিল ভাস্করের হাতে। ব্যস্তভাবে সেখানি গ্রহণ করেই এক নিঃশ্বাসে কথা কটি পড়ে গেলেন। বললেন: কে দিল এই পত্র।

তাঁর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

বৃদ্ধা তার কর্তব্য শেষ করে ফিরে যাচ্ছিল, বলল : জানিনে।

সুখ দুঃখের আবেদন শূন্য পরম নিশ্চিন্ত উত্তর।

কোথায় পেলে তাহলে ?

তাও জানিনে।

কাকে লেখা এ পত্র তাও কি জান না ?

বৃদ্ধা তার দন্তহীন মুখ আনন্দে উজ্জ্বল করে বলল : তাও না।

বিরক্ত হলেন ভাস্কর দেব। বললেন : তবে এই বিজয়নগরে এত বীর থাকতে কেন এক বিদেশীর হাতে এ পত্র দিলে ?

পিছন ফিরে বৃদ্ধা বলল : বিদেশী বলেই দিয়েছি। বিজয়নগরে আজ বীর কোথায় ?

শোন ?

ভাস্কর ডাকলেন।

বৃদ্ধা দাঁড়াল না। লাঠি ঠুকে ঠুকে যেমন এসেছিল, তেমনি সন্তর্পণে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তব্ধ বিস্মিত ভাস্করের হাত থেকে পত্রখানি সংগ্রহ করে আমি তা পড়ে ফেললেম। বড় সংক্ষিপ্ত পত্র।

'দুঃস্থা নারীকে রক্ষা করবার স্পৃহা থাকলে মতঙ্গ পর্বতে পরশুরামের মন্দির প্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ কর। পরিচয় গোপনের জন্য ব্রাহ্মণের বেশে এস রক্ত গোলাপ হাতে সূর্যাস্তের এক দণ্ড পরে।'

ভাস্কর দেবকে চিন্তাগ্রস্ত দেখলেম, বললেম : ভয় পেলে বন্ধু ?

ভাস্কর উত্তর দিলেন : ভয়কে যে জয় করেনি, সে ক্ষত্রিয় নয়। আমি ভাবছি, সেই দুঃস্থা নারীর কথা, যাকে বিদেশীর সাহায্য প্রার্থনা করতে হল। ভাবছি সেই নারীর দুর্ভাগ্যের কথা, যা তার নিজের দেশের বীরকে বলা যায় না।

বললেম : সে যদি এমন কোনও নারী হয়, যে উদ্ধার পেতে চায় তার নিজের দেশের বীরের কবল থেকেই ?

ভাস্কর চমকে উঠলেন, বললেন : এমন নারীও আছে এ দেশে ?

বন্দিনী রাজকন্যার কথা আমার মনে পড়ল। চোখের সামনে দেখা তাঁর অসহায় মুখচ্ছবি দেখতে পেলেম। তাঁর ভয়, তাঁর উদ্বেগ, তাঁর আত্মবলিদানের বেদনা আমার সুস্থ মনকে হঠাৎ আলোড়িত করে তুলল। ভেঙ্কটাদ্রির কথা আমি ভাস্করকে বলি নি, বলি নি তার সঙ্গে রাজকন্যার সম্পর্কের কথা। এবারেও তা গোপন করে গেলেম। বললেম : কোন্ দেশে নেই ? কোন্ সমাজে নেই ? কোন্ ঘরে নেই ?

ভাস্কর কথা কইলেন না।

কুটীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বললেম : তুমি যেও, কিন্তু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে যেও।

তারই সঙ্গে যোগ দিলেম : এ পত্র সত্য হলেই আমি সুখী হব।

এ কথারও উত্তর দিলেন না চিন্তাক্লিষ্ট রাজপুত্র।

ভাস্করকে আজ খানিকটা সঙ্গ দেবার ইচ্ছা হল। পথে নেমে বললেম : একই পথে রোজ যাই আসি, চল আজ এই পথে ঘুরে যাই।

অনাসক্তভাবে ভাস্কর বললেন : বড় দীর্ঘ পথ মনে হচ্ছে। এ পথে গেলে তোমার বিলম্ব হবে।

বললেম : তাতে ক্ষতি নেই। একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলেই বিলম্ব কম হবে।

চল।

সম্মত হয়ে ভাস্কর আমার অনুসরণ করলেন।

খুশী হয়ে বললেম : সেদিন দূর থেকে মিনারের মতো উঁচু এক অট্টালিকা তোমাকে দেখিয়েছি। সে ঐ সামনের প্রান্তরে। ভাল করে তোমাকে দেখাবার জন্যই আজ এপথে আনলেম।

গম্ভীর ভাবে ভাস্কর বললেন : বুঝেছি কী দেখাবে তুমি।

বল !

বিজয়নগরের উৎসব ক্ষেত্র।

বললেম : উৎসব ক্ষেত্র বললে যেন সবটুকু বলা হয় না। হোলি দীপাবলী ও রাম নবমীতে যে উৎসব হয়, বিদেশী পর্যটকেরা বলে গেছেন যে সারা বিশ্বে তার তুলনা নেই। যথার্থই তা রাজকীয় উৎসব। সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ হবে। নানা খণ্ডে বিভক্ত এই সুবিশাল রাজ্য বহু রাজা ও শাসনকর্তা কর্তৃক সুশাসিত। উৎসবের দিনে এঁরা আপন আপন সেনাবাহিনী নিয়ে মহারাজাকে সম্মান প্রদর্শন করতে আসেন। শুনেছি, সে অভাবনীয় ব্যাপার। মাঝখানে নবতল হর্ম্যে সামন্তরাজ পরিবৃত হয়ে বসবেন বিজয়নগরাধিপতি। পাত্র মিত্ররা বসবেন অন্যান্য উচ্চ অট্টালিকায়। অপূর্ব কারুকার্যখচিত এই সব অট্টালিকা। একটি বৃত্তাকার গৃহও আছে। নানা দৃশ্যে মনোহর এই গৃহটি ঘুরে ঘুরে দর্শকের মনোরঞ্জন করে।

পথ চলতে চলতে ভাস্করদেব আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললেম : সিংহাসনে বসে মহারাজা এই সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। প্রথম সারিতে দাঁড়াবে সুসজ্জিত হস্তীযূথ, তাদের পিঠে ভল্লধারী যোদ্ধা। দ্বিতীয় সারিতে কুঠার ও কার্মুক হাতে অশ্বারোহী সেনা। তৃতীয় সারিতে তীরন্দাজ, হাতে রৌপ্যমণ্ডিত ধনুক, পিঠে বাণপূর্ণ সুবর্ণ তূণ, কটিতে কুঠার। সকলের শেষে পদাতিক, বামহাতে গণ্ডকচর্মের ঢাল ও দক্ষিণ হাতে কোষমুক্ত কৃপাণ। এ দৃশ্য কল্পনা করতে পার ভাস্কর ?

ভাস্করকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। সোৎসাহে উত্তর দিলেন : বিজয়নগর যদি বিজয়ী হয়, এই উৎসব দেখে চক্ষু সার্থক করে যাব।

আমি চমকে উঠলেম। বললেম : বিজয়নগর বিজয়ী হবে না, তুমি কি এমনি আশঙ্কায় আজ উদ্বিগ্ন হচ্ছ ?

ভাস্কর উত্তর দিলেন : এ সংবাদ তো তোমার কাছেই পাওয়া বন্ধু। চাণক্যের মতো তুমি আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ করে দিয়েছ। তোমাকে ধন্যবাদ।

বললেম : সবটুকু এখনও জানা হয় নি। রাজা আর পারিষদ নিয়েই তো বিজয়নগর নয় বন্ধু। লক্ষ লোকের বাস এই নগরে, কোটি প্রজা এ রাজ্যে প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের সুখ দুঃখের খোঁজ রাখ কি ?

নির্বাক বিস্ময়ে ভাস্কর আমার মুখের দিকে চাইলেন।

বললেম : আমি ঠিক কথাই বলছি। যুদ্ধ করে ধর্মান্ধ মানুষ, ধর্ম রক্ষার আর ধর্মের বিস্তারের জন্য। আর যুদ্ধ করে দেশপ্রেমিক, দেশ রক্ষার আর মাতৃভূমির মর্যাদার জন্য। জয়ের নেশা এদের উষ্ণ ধমনীতে। বুকের রক্ত দিয়ে এরা যুদ্ধ জয় করে।

একটু থেমে বললেম : বিজয়নগরের জনসাধারণকে জানতে এখনও আমার বাকী আছে।

ভাস্কর আবার গম্ভীর হলেন।

আমরা সেই শূন্য উৎসব ক্ষেত্র দেখে সেই মুক্ত প্রান্তরটি অতিক্রম করে প্রধান রাজপথে এসে উপস্থিত হলেম। একশো হাত প্রস্থের এই রাজপথটি বিরুপাক্ষ মন্দির থেকে মতঙ্গ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। চলতে চলতে আমরা প্রাসাদের সিংহ দ্বারে এক সময় পৌঁছে গেলেম।

কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?

আমি প্রশ্ন করলেম।

চিন্তিতভাবে ভাস্কর বললেন : প্রাসাদের দক্ষিণ সিংহদ্বারে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

॥ তেরো ॥

কিন্তু ভাস্করকে বিদায় দিয়ে নতুন ভাবনা এল মনে। ভাবনা নয়, কৌতূহল। অকারণ কৌতূহল যে ব্রাহ্মণের সাধনার অন্তরায়, তা জানি। তবু কৌতূহলী হয়েছি। আজ কোন্ দুঃস্থা নারীর জন্য ভাস্করদেব যাবেন মতঙ্গ পর্বতে ধূসর অপরাহ্ণে, পরশুরামকে সাক্ষী রেখে কোন্ নারীকে উদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করবেন এই ক্ষত্রিয় রাজকুমার, তা জানবার জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা অনুভব করছি। আমার চেয়ে বেশি জানেন না ভাস্কর, কে জানেন তাও আমি জানিনে। তবু আমার অবাধ্য মন কিছু জানতে চাইছে।

যা জানার কোন উপায় নেই, তাকে জানবার আগ্রহও নেই সাধারণ মানুষের। থাকলে প্রতিদিন কত নতুন সত্য আবিষ্কৃত হত। যে কথা অনেকে জানে, সে কথাও সকল মানুষ জানতে চায় না। মানুষ মরে সেই কথা জানবার চেষ্টায়, যে কথা অল্প লোক জানে, আর জেনেও তা গোপন রাখতে চায়। যে ধন ছড়ান আছে আপন শ্রমের ক্ষেত্রে, মানুষের লোভ নেই তাতে। মানুষ ছুটেছে গুপ্তধনের সন্ধানে। আমারও আজ বুঝি সেই গুপ্তধন চাই। অন্তঃপুরে আজ কিছু অনুসন্ধান করব, মনে মনে এই বাসনা নিয়েই অধ্যাপনায় এলেম।

সহচরী সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল প্রবেশ পথের উপরেই। প্রণাম করে বলল: কাল আপনার আচরণে বড় সংশয় জেগেছে গুরুদেব। রাজকন্যার সামনে জিজ্ঞাসা করলে পাছে অসন্তুষ্ট হন, তাই এখানেই অপেক্ষা করছি।

প্রশ্ন করবার অনুমতি আমি দিলেম।

সরস্বতী বলল: কাল সকাল বেলা অধ্যাপনায় এসে আপনি জানিয়েছিলেন, রাজকুমার ভাস্করদেব প্রশস্ত রাজপথে এক যবন সেনা বন্দী করেছেন। আজ সভামধ্যে রাজকুমার বললেন, সেই যবনকে বন্দী করেছেন আপনি নিজে। আমরা নিজেরা এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোন সদুত্তর পাই নি।

লজ্জিত হয়ে বললেম: মিথ্যা ভাষণের দায় থেকে ভাস্কর আমাকে রক্ষা করলেন। নিজের অসিতে তাঁর বিশ্বাস আছে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কাছে নেই তাঁর যশের প্রত্যাশা।

সরস্বতী বলল: রাজকুমারের আচরণ সম্বন্ধে আমরাও এই সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু আপনার গৌরব গোপনের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা ভেবে পাই নি।

বললেম: ব্রাহ্মণের গৌরব তো ক্ষত্রিয়ের ধর্মে নয় সরস্বতী। বিজয়নগরে আপন পরিচয় দেবার জন্য ঐ গৌরবটুকুর প্রয়োজন ছিল ভাস্কর দেবের। সেটুকু গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করতে সে রাজী হল না।

কী একটা আবেগে সরস্বতী নীরব হল।

বললেম: রাজকন্যার ভার শেষে ভাস্করকেই দিলে?

দুঃসাহসিকতা ছিল এ প্রশ্নেন ভিতর। উত্তরের জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই এসেছি।

ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী চেপে সরস্বতী ভয়ার্ত দৃষ্টিক্ষেপ করল চারিদিকে, কাউকে না দেখে বলল: আমরা শত্রু পরিবৃত হয়ে আছি গুরুদেব। অন্তঃপুরে আমরা নজর বন্দী।

আজ প্রথম তাদের ভীত চকতি দৃষ্টির অর্থ বুঝলেম। এতদিন এই দৃষ্টি দেখে ভেবেছি, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা তারা। সরস্বতীর কথায় আজ সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেল। দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস পেলেম না।

দেখলেম, অধ্যয়ন কক্ষ থেকে মখমলের মসলন্দ রাজকন্যা সরিয়ে দিয়েছেন। আমার আসনের সম্মুখে আজ তাঁরও দর্ভাসন। পরিধানের রেশমের শুভ্র বস্ত্রের উপর সদ্যস্নাত সিক্ত কেশদাম বর্ষণক্লান্ত মেঘের মতো মেদুর। ঘনকৃষ্ণ আঁখি পল্লবের নীলাঞ্জন এখনও আর্দ্র। সুন্দর গৌর মুখে একটা পাণ্ডুর বিষণ্ণতা। আমাকে প্রণাম করলেন।

নিজে উপবেশন করে তাঁকে আসন নিতে বললেম।

রাজকন্যার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করলেম। কক্ষের অভ্যন্তরে এমন একটা শান্তি বিরাজ করছে যে নিজের আশ্রম বলে ভুল হল। আমি সেই প্রসঙ্গ দিয়েই আলাপ শুরু করলেম। বললেম: কিছু পরিবর্তন যেন লক্ষ্য করছি!

রাজকন্যা যেন খুশী হলেন, বললেন: অধ্যয়নের জন্য যা কিছু অন্তরায় বলে মনে করেছি, তা আজ সরিয়ে দিয়েছি। মখমলের মসলন্দ, মুক্তার ঝালর, পার্থিব ঐশ্বর্যের এ সব বিজ্ঞাপন থাক্ রাজসভার জন্য, এখানে বড় হোক আত্মার ঐশ্বর্য।

রোমাঞ্চ হল আজ রাজকন্যার কথায়। গভীরভাবে তাঁকে আশীর্বাদ করলেম, বললেম: তোমার সাধনা সফল হবে।

রাজকন্যা আবার আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

একসময় বললেন: কাল সন্ধ্যার সম্মান সভায় আপনার অসম্মানের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি গুরুদেব!

আশ্চর্য হয়ে বললেম: আমার অসম্মান তো হয়নি কাল!

রাজকন্যা আপত্তি জানিয়ে বললেন: হয়েছে বৈকি গুরুদেব! ব্রাহ্মণের সম্মানের জন্য যে সভা অহ্বান করা হয়, দেবমন্দিরের ধর্মসভার মতো তার পবিত্রতা! কাল আমার পিতা প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, তাঁর আচরণ আমাকে পীড়া দিচ্ছে।

আমি একটা সৌজন্য সম্মত উত্তর দিতে যাচ্ছিলেম। হঠাৎ রাজকন্যা প্রশ্ন করে বসলেন: আচ্ছা গুরুদেব, শাস্ত্রে কি সুরাপান নিষিদ্ধ হয়েছে?

বললেম : হিন্দুর সকল শাস্ত্রেই এ কাজ নিষিদ্ধ। এর প্রায়শ্চিত্তের দণ্ডও বড় কঠোর।

বলে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনালেম :

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মহদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া সকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশকৃদ্র সমেব বা॥

সংক্ষেপে এর অর্থ বললেম রাজকন্যাকে : অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সুরাপান করে মৃত্যুবরণ করলেই শুধু পাপস্খালন হবে। অজ্ঞানকৃত সুরাপানেরও প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্য। দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মহত্যার কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করে দ্বিজেরা দেহ শুদ্ধ করবেন।

রাজকন্যা শিহরে উঠে চক্ষু মুদ্রিত করলেন। হয়তো তাঁর পিতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অনেকক্ষণ কোন কথা কইতে পারলেন না।

প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন : গুরুদেব, আজ এই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে চাইলে আপনি কি বিরক্ত হবেন?

উত্তর আমার ওষ্ঠেই ছিল। বললেম : শাস্ত্রালোচনায় বিরক্তি তো ব্রাহ্মণের জন্য নয় রাজকন্যা!

রামায়ণ খুলে বসবার উদ্যোগ করছিলেম। বন্ধ করে বললেম : সেই ভাল, এস আজ শাস্ত্রের অনুশাসনেরই আলোচনা করি।

তারপর শাস্ত্র ছেড়ে ইতিহাসের আলোচনা কখন শুরু করেছি, মনে পড়ে না।

সময়ের হিসেব আজ আমরা ভুলে গেলেম।

বিদায়কালে প্রণাম করবার সময় রাজকন্যা বললেন : গুরুদেব, আজ আমার কী ইচ্ছা করছে জানেন?

তাঁর মুখের দিকে তাকালেম।

গায়ত্রী বললেন : মতঙ্গ পর্বতে যে বিদ্যাকেন্দ্রের উদ্বোধন আপনি করেছেন, তাতে আমিও যেন একটি ভার পাই। আপনাদের সেবার ভার। বিশ্বাস হচ্ছে, তাতেই আমার অভিশপ্ত জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

আমি বুঝি আত্মবিস্মৃত হলেম। মনে হল, এ বাণী যেন রাজকন্যার একার মর্মবেদনা নয়। এ বুঝি, বিশ্বের সমস্ত ভোগ-ক্লান্ত নরনারীর অশান্ত আত্মার পরম জীবনবোধ!

॥ চৌদ্দ ॥

ভেবেছিলেম, আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়ে ফিরে ভাস্করকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা পরিক্রমায় বাহির হব। বালির রাজত্ব কিষ্কিন্ধ্যার উপর গড়ে উঠেছে বিজয়নগর রাজ্য। এর প্রতিটি ধূলিকণায় আছে ভগবান রামচন্দ্রের পদরজঃ। ধার্মিকেরা বলেন, সেই পদরজঃই আজ সোনা হয়ে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করছে বিজয়নগরকে।

প্রভাতে আজ প্রসন্ন দেখি নি ভাস্করকে। তার কারণ আমি জানি। সকালের সেই পত্র তাঁকে চিন্তান্বিত করেছে। তাই ভাবছিলেম, আজ তাঁকে কিষ্কিন্ধ্যা দেখাব। রামচন্দ্রের নামে মুমূর্ষু'রও মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ভাস্করের হবে না!

কিন্তু ফিরতে বিলম্ব হল। সকালের সূর্য তখন প্রখর হতে শুরু করেছে। আহার না সেরে আর কোথাও বাহির হবার উপায় রইল না।

প্রাসাদের দক্ষিণ সিংহদ্বারে ব্যস্তভাবে পদচারণা করছিলেন ভাস্কর। যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, এমনি স্বরে অভিযোগ জানালেন। বললেন: বড় বিলম্ব হল তোমার। রামায়ণ ছেড়ে মেঘদূত শুরু করলে বুঝি?

হঠাৎ যেন রহস্যের সুর ধরা পড়ল ভাস্করের প্রশ্নে।

হেসে বললেম: কিন্তু কাব্য নিয়ে আলোচনাই আজ হল না।

ভাস্কর এবারে বিস্মিত হলেন, বললেন: তবে কি অধ্যয়ন তিনি ছেড়ে দিলেন, না এবারে নতুন আচার্য আসবেন?

তাঁর চিন্তার ধারা দেখে হাসি এল। আশ্বাস দিয়ে বললেম:

না না, যা ভাবছ তা নয়। আজ দেবগিরির ইতিহাস শোনালেম তাঁকে। শোনালেম, ওরঙ্গল ও দেবগিরি, দক্ষিণ ভারতের এই দুই রাজ্যের ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠার কথা।

চমকে উঠে ভাস্কর প্রশ্ন করলেন : এই কথা জানতে চাইলেন রাজকন্যা ?

ভুলে গেছি, কোন্ কথা প্রসঙ্গে তাঁকে আজ এই গল্প শুনিয়েছি। বললেম : তাতো স্মরণ হচ্ছে না! বোধ হয় জানতে চেয়েছিলেন, তা না হলে কাব্য ফেলে ইতিহাস শোনাব কেন!

রাগত স্বরে ভাস্কর বললেন : শুধু অধ্যয়ন আর অধ্যাপনাই শিখেছ ব্রাহ্মণ, জীবনের প্রয়োজনের কথা শেখ নি!

হেসে বললেম : তাও শিখেছি সুষ্ঠু ভাবে। গৃহে পৌঁছে কয়েক দণ্ড সময় দিও আমাকে, শীঘ্রই তোমার আহার্য আমি প্রস্তুত করে আনব।

ভাস্কর এবারে রাগান্বিত হলেন, বললেন : মিথ্যা তোমার কাব্যচর্চা। অনুরাগহীন শুষ্ক অন্তর দিয়ে শাস্ত্রাধ্যয়ন হয়, কাব্যের রস বোধ হয় না। রাজকন্যার কাব্যপ্রীতি যদি কিছু থাকে, তোমার সান্নিধ্যে এসে তা যে কর্পূরের মতো উবে যাবে তাতে আজ আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমি তাঁর রাগের উত্তরে শুধু হাসলেম।

ভাস্করের ক্রোধ তাতে বেড়ে গেল। বললেন : হাসতে তোমার লজ্জা করে না ?

বললেম : এখনও করে না। যেদিন জানব যে তোমার মতই রাজকন্যার মত, সেদিন নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিজেই বিদায় নিয়ে আসব।

কথার উত্তর পেয়ে ভাস্করের রাগ খানিকটা প্রশমিত হল। বললেন : রাজকন্যা এখনও তোমাকে অক্ষম মনে করেন না, এই তো!

বললেম ঃ করলে, আজ সারাটা সকাল আটকে রাখতেন না।

ভাস্কর আরও খানিকটা সুস্থ হলেন, বললেন ঃ আর কী আলোচনা হল ?

তাঁর পাশে চলতে চলতে বললেম ঃ মনু সংহিতা।

ভাস্কর আবার ক্ষেপে উঠলেন, বললেন ঃ তুমি কি রাজকন্যাকে উন্মাদ করবে ? এই বয়সে মনু সংহিতার আলোচনা ?

বললেম ঃ শুধু মনু সংহিতাই নয়, অত্রি সংহিতা উশনঃ সংহিতা বশিষ্ঠ সংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা থেকেও শ্লোক উদ্ধৃত করে আমি মনুর মতকে সমর্থন করেছি।

ভাস্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে হল, আমাকে সংস্কারের অযোগ্য ভেবেই বোধ হয় তাঁর এই দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তবু প্রশ্ন করলেন ঃ কী বিষয়ে আলোচনা হল ?

আমি হেসে বললেম ঃ রাজকন্যা আজ বড় লজ্জিত বোধ করছিলেন। বলছিলেন, কাল সন্ধ্যায় তাঁর পিতা প্রকৃতিস্থ ছিলেন না বলে তাঁর অনুশোচনার অন্ত নেই। ব্রাহ্মণকে সম্বর্দ্ধনার জন্যে যে সভা আহ্বান করা হয়েছে, দেবমন্দিরের সভার মতো তার মর্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল।

ভাস্কর বললেন ঃ তারপর ?

বললেম ঃ এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, সুরাপান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কিনা। আমি সত্য কথাই বললেম। কোনও শাস্ত্রই এ পাপ সমর্থন করে'নি। প্রায়শ্চিত্তের কথাও তাঁকে জানিয়ে দিলেম। অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সুরাপান করে মৃত্যুবরণ করলেই কেবল পাপস্খালন হবে।

ভাস্কর চমকে উঠলেন, বললেন ঃ বল কী! এমন নিষ্ঠুর তোমার শাস্ত্রকারেরা! এ যুগেও কেউ মানে তোমার শাস্ত্র ?

বললেম ঃ যাঁরা মানবার দরকার মনে করেন, তাঁরা মানেন। আর যাঁরা তা মনে করেন না, তাঁরা পরলোকে কী শাস্তি পান, তা আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাইনে। এই দণ্ড থেকে রাজাদেরও

নিস্তার নেই। কাম ও ক্রোধ থেকে জাত সাতটি গুরুতর দোষে প্রায় সমস্ত রাজাই আজকাল দুষ্ট। তাঁদেরও সাবধান করে দিয়েছেন মহর্ষি মনু।

ভাস্কর প্রশ্ন করলেন : কী সেই সাতটি দোষ?

বললেম : সুরাপান, পাশাখেলা, নারীতে আসক্তি, মৃগয়া, নিষ্ঠুর প্রহার, পরুষ বাক্যের ব্যবহার ও পরস্বাপহরণ। সুরাপানই সব চেয়ে দূষণীয়।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাস্কর বললেন : আশ্বাস এইখানে যে শকুনের শাপে গরু মরে না।

বললেম : সেই আশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাক।

॥ পনেরো ॥

আশ্রমে ফিরে জীবনের আর একটা দিক আমরা দেখতে শিখলেম : যা দেখতে পাচ্ছি, যা শুনতে পাচ্ছি, স্পর্শ গন্ধ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি যে জীবন, তার আরও একটা অন্ধকার দিক আছে। আমাদের কাছে তা অদৃশ্য। নদীর জলের মতো তার ধারা স্বচ্ছ নয়, আমাদের সুস্থ মন দিয়ে তার কূলও দেখতে পাইনে। এবারে সেই অদৃশ্য জীবনের একটা সঙ্কেত পেয়ে গেলেম।

ভাস্কর বোধ হয় এমনি কিছু ভাবতে ভাবতে আসছিলেন। কুটীর দ্বারে উপনীত হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন : একখণ্ড ভূর্জপত্র নয় ?

তাঁর অঙ্গুলির নির্দেশ অনুসরণ করে দেখলেম : ভূর্জপত্রই বটে। মন্দবায়ে ইতস্ততঃ উড়ে উড়ে ভাস্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

মাত্র একটি মুহূর্ত। তার পরেই ভাস্কর সেখানা কুড়িয়ে আনলেন।

এমন সংক্ষিপ্ত পত্র আগে দেখি নি। গোটা গোটা অক্ষরে শুধু লেখা আছে, সাবধান। কে লিখেছে, কাকে লিখেছে, তার নাম নেই কোনখানে।

ভাস্কর ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন : প্রভাতে যে পত্র পেয়েছি, এ তারই উত্তর। যে পক্ষ সাহায্য প্রার্থনা করেছে, তার প্রতিপক্ষের সাবধানী।

বললেম : শুধু তাই নয়। এই প্রতিপক্ষের হাত থেকেই সেই দুঃস্থা নারীকে তোমায় রক্ষা করতে হবে।

চিন্তিতভাবে ভাস্কর বললেন : বোধ হয় তাই!

আহারের পর যখন অঙ্গনে নেমে বসলেম, ভাস্করের মন তখনও শান্ত হয় নি। পাতার ভারে ঝুলে পড়েছিল একগুচ্ছ মাধবীলতা। ফুল নেই, ফুলের মরশুমের জন্য তার নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। ভাস্কর সেইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, বললেন : আজকের বিজয়নগরকে ঐ মাধবীলতার সঙ্গে আমার তুলনা করতে ইচ্ছে করছে।

কেন বলতো ?

আমি প্রশ্ন জানালেম।

সেদিক থেকে মুখ না সরিয়ে ভাস্কর বললেন : যা দেবার ছিল, তা দিয়ে ও নিঃস্ব হয়ে গেছে।

বললেম : ওতো সাময়িক, আরও দেবার দিন আবার ও ফিরে পাবে।

ভাস্কর বললেন : ও হয়তো পাবে, কিন্তু বিজয়নগর পাবে না। এ বিষয়ে আমি আজ নিশ্চিত হয়েছি।

আমি চমকে উঠলেম, বললেম : তুমি নিশ্চিত হয়েছ ?

ভাস্কর বললেন : রাজপ্রাসাদে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি নি। এই নগরের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে বাজারে প্রবেশ করেছিলেম।

নির্বাক দৃষ্টিতে আমি আমার কৌতূহলের পসরা এগিয়ে দিলেম ভাস্করের সামনে।

রাজকুমার থামলেন না, বললেন : এক জ্ঞানবৃদ্ধের মুখে শুনেছিলেম যে কোনও নগরের সত্যরূপ দেখতে হলে, তার মানুষকে চিনতে হলে, প্রথমে যেতে হবে তার বাজারে, দেবালয়ে আর—

কথাটা ভাস্কর শেষ করলেন না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি প্রশ্ন করলেম : আর ?

আর সাধারণ প্রমোদালয়ে।

লজ্জিতভাবে ভাস্কর আমার মুখের দিকে চাইলেন

সে কী কথা!

আমি আশ্চর্য হলেম।

সত্যি কথা : ভাস্কর উত্তর দিলেন : আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এ কথায় সত্য আছে। তোমার শাস্ত্র কী বলে আমি জানিনে, তা নিয়ে অনধিকার চর্চা করব না। কিন্তু আমার মন বলে, এই তিন স্থানেই মিলিতভাবে মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়।

নীরব থেকে আমি আরও কিছু শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেম।

ভাস্কর বললেন : বাজারে যে মানুষ দেখি, সে মানুষ শুধু তার সঙ্গতির পরিচয় দেয়। জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন, সঙ্গতি অনুসারে তাই সে সংগ্রহ করতে আসে। এ তার বাহিরের রূপ, তার দারিদ্র্য-সচ্ছলতার সংবাদ, তার সমাজের আর্থিক প্রতিচ্ছবি। দেবালয়ে তার অন্য রূপ, সেখানে তার আত্মার পরিচয়। কিন্তু তার ভিতরেও ফাঁকি আছে। শিক্ষা ও সংস্কার দিয়ে মানুষ মানুষকে চিরকাল ফাঁকি দিচ্ছে। মানুষের বিচারে সেখানেও ভুল হয়।

ভাস্কর থামলেন খানিকক্ষণের জন্য, তারপর বললেন : আমাকে তুমি কী ভাববে জানিনে, আমি মানুষের সত্য পরিচয় পাই প্রমোদালয়ে। সেখানে দরজার চৌকাঠে তার মুখোশ খুলে মানুষ ভিতরে ঢোকে। মদ্যপকে তোমরা ঘৃণা কর, আমি তাদের ভালবাসি। মাতাল তো পশু নয়, সে খোলস খোলা খাঁটি মানুষ। তার সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা সুকৃতি-দুষ্কৃতির নির্ভীক বিজ্ঞাপন। সেখানে যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সে মানুষ নয়, অতি মানুষ। সে দেবতা। প্রমোদালয়ে আমি দেবতার অনুসন্ধান করি।

ভাস্করের যুক্তিতে আমি স্তম্ভিত হলেম। এমন যুক্তির কথা আমার ধর্মশাস্ত্রে লেখা নেই। উত্তর দেবার চেষ্টা করে আমি ব্যর্থ হলেম।

ভাস্কর আমার মনের ভাব পড়তে পারলেন কিনা জানি না, বললেন : তুমি কি রাগ করলে মাধব ?

রাগ ? রাগ কেন করব ?

ক্ষুব্ধ স্বরে ভাস্কর বললেন : রাগ করবার মতো কথা যে আমি বলেছি মাধব। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

অসীম অনুরোধে সিক্ত হল তাঁর ছুচোখের দৃষ্টি।

তুমি কি সেখানেও যাবে ভাবছ ?

সংযত কণ্ঠে ভাস্কর জবাব দিলেন : তোমাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার নেই।

আর, যদি আঘাত না পাই ?

সত্যি বলছ মাধব ?

উত্তেজনায় ভাস্কর আমার ছুহাত চেপে ধরলেন।

কিন্তু কী লাভ হবে তোমার ?

লাভ ? লাভের কথা তো তোমায় আগেই বলেছি। বিজয়নগরের মানুষকে আমি চিনতে পাব।

নিজেকে আমি আর সংবরণ করতে পারলেম না, বললেম : নিজের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে তুমি মানুষ চিনবে ?

ভাস্কর আশ্বাস দিলেন : তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কোথাও যাব না।

সে আমি জানি। কিন্তু—

কিন্তু কী মাধব ?

শীতের মধ্যাহ্ন যে শেষ হয়ে এল !

ভাস্কর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেম : সত্যিই তো। মতঙ্গ পর্বতে যাবার জন্য আমায় যে প্রস্তুত হতে হচ্ছে।

হেসে বললেম : সূর্যাস্তের এখনও দেরি আছে।

উঠে পড়ে ভাস্কর বললেন : চল, তোমার ব্রাহ্মণের বেশে আমায় সাজিয়ে দেবে।

তার পরেই চিন্তিত হলেন, বললেন: কিন্তু রক্ত গোলাপ পাব কোথায়?

তার ভাবনা নেই, আমার বাগানেই রক্ত গোলাপ ফুটেছে।

শুভ্রবস্ত্রে ও উত্তরীয়ে সাজিয়ে দিলেম ভাস্করকে। কোমরে বেঁধে দিলেম একখানা ঝকঝকে ছোরা। উত্তরীয়ের প্রান্ত গুঁজে আড়াল করে দিলেম তার দৃশ্যমান হাতলখানা। ভাস্কর খুশী হলেন, পায়ের পাদুকার দিকে চেয়ে বললেন: এ যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি, আমার অপরাধ নিও না।

আমি হেসে উত্তর দিলেম: ব্রাহ্মণ নির্লোভ হয়, সে কথা ভুলে যেও না।

মালঞ্চ থেকে রক্ত গোলাপ তুলে আনলেন ভাস্কর নিজে।

তাকে এগিয়ে দিয়ে বললেম: সঙ্গে যাব?

আমার মতোই হেসে উত্তর দিলেন ভাস্কর, বললেন: ক্ষত্রিয় ভীরু হয় না, সে কথা ভুলে যেও না।

আমরা দুজনেই হাসলেম।

বিদায় দেবার আগে বললেম: আমার আশীর্বাদ নিয়ে যাও।

ভাস্কর দাঁড়ালেন।

আমি আমার কোঁচার খুঁট থেকে একখণ্ড ভূর্জপত্র বার করে দিলেম। সেই ভূর্জপত্রখানি। যাতে গোটা গোটা অক্ষরে এখনও জ্বলজ্বল করছে: সাবধান!

হাত বাড়িয়ে ভাস্কর তা গ্রহণ করলেন। বললেন: তোমার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রইল।

ভাস্কর এগিয়ে গেলেন। আমি চেয়ে রইলেম তাঁর পায়ের দিকে। নির্জন পথের উপর পাদুকার শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। আজ তাঁর চলার ভিতর অনভ্যাসের লক্ষণ আমি খুঁজে পেলেম না।

॥ ষোল ॥

পথের উপর ভাস্করের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আমার মন চঞ্চল হল। ভাবলেম, এ বুঝি ভুলই হল আমার। ভাস্করকে একা ছেড়ে দেওয়া বুঝি উচিত হয় নি। বিজয়নগরে হত্যা নেই শুনেছি, নেই পাপাচার। সত্যের উপর, ধর্মের উপর যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সেখানে আত্মরক্ষার দুর্ভাবনাও নেই।

তবে আমি কেন ভয় পাচ্ছি? সঙ্গতভাবেই পাচ্ছি কি? ভাস্কর আজ বাজারে কী দেখে এসেছেন তিনিই জানেন। সে কথা ভাল করে জেনে নেওয়া হয় নি। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল, আমি তাঁর সন্দেহের কারণ দেখতে পাচ্ছি। বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রতারণা করছে, আর প্রতারিত মানুষ সেই প্রতারণাকে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে সমাজের ভিতর।

মানুষ মানুষকে কেন প্রতারণা করে? এ পাপের উৎস কোথায়? নিশ্চয়ই কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে ভরবার জন্য এই প্রতারণা। কোথাও যদি ফাঁক না থাকে তো ফাঁকি দেবার দরকার হবে কেন?

মন আমার অশান্ত হল, উদ্বিগ্ন হল। চোখ বন্ধ করে দেখলেম, গোধূলির অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে দুরন্ত অমঙ্গল। ছল করে লুকিয়ে আছে, ছুতো পেলেই লাফিয়ে আসবে সামনে। ভাস্কর বোধ হয় ঠিকই বলেছেন, বিজয়নগরের পাকা ভিতে ফাটল ধরেছে। তলায় ঘুণ ধরেছিল অনেকদিন আগেই।

নিশ্চিন্তে আর বসে থাকতে পারলেম না। উত্তরীয় জড়িয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লেম। একটা রক্ত গোলাপ সঙ্গে নেব কি?

ছি ছি, এ আমি কী ভাবলেম? কাকে প্রতারণা করার জন্য রক্ত গোলাপ নেব? সেই নারীকে, ভাস্করের নিকট যে মুক্তির সন্ধান চায়? না তার প্রতিপক্ষকে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগে বাধা দেবার জন্য যে উদ্যত হয়েছে? না না, নারীকে কেন ছলনা করব? ছলনা তো সেই আততায়ীর সঙ্গে, ভাস্করের মঙ্গলের জন্য।

কিন্তু কী প্রয়োজন তার? মানুষের উপর বিশ্বাস কি আমরা হারিয়ে ফেলেছি? বোধ হয় সত্যিই হারিয়েছি। তা না হলে বুকের ভিতর ভয় এমন করে ঠেলে উঠবে কেন? মানুষ তো বন্য পশু নয়, বিচার বুদ্ধি আছে বলেই মানুষ। মানুষকে কেন ভয় পাব?

তবু ভয় গেল না। মনে হল, বিপদের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছি ভাস্করকে। সে ফিরে না এলে শান্তি পাব না। কিন্তু আমার অপরাধ কী? আমি তো পাঠাই নি তাকে। সে ক্ষত্রিয়, সে তার ধর্ম পালন করেছে স্বেচ্ছায়। প্রাণের ভয়ে সে তার পৌরুষকে, তার যৌবনকে উপেক্ষা করে নি। আমি কেন নিজেকে অপরাধী মনে করব?

বুকের ভিতর জমাট বেঁধেছে ভয়, জমেছে দুর্ভাবনা। চেষ্টা করেও তাকে তাড়াতে পারলেম না। রক্ত গোলাপ হাতে নিলেম না বটে, কিন্তু পথ চলতে চলতে অনুভব করলেম, আমার রক্তের ভিতর ভয়ের গোলাপ একটি একটি করে তার পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে।

এক সময় মতঙ্গ পর্বতের নিচে এসে পৌঁছে গেলেম।

পশ্চাতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে এধারে। ভেবেছিলেম, পথেই হয়তো ভাস্করের দেখা পাব। সে এসেছে ধীর পদক্ষেপে, আমি ত্বরিত গতিতে। পর্বতের পাদদেশে সাক্ষাৎ

পেলেই যেন স্বাভাবিক মনে হত। জনবিরল পথ বেয়ে ধীরে ধীরে আমি উঠতে লাগলেম।

গোধূলির অন্ধকারও নামছিল ধীরে ধীরে। নাতি-প্রশস্ত পার্বত্যপথ। লতাগুল্মে ছেয়ে আছে দুই ধার। বড় বড় বৃক্ষ আছে, আর আছে ধূসর প্রস্তরখণ্ড। ছায়ার সঙ্গে ভয়ও মিশে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

ওকি! চমকে থমকে দাঁড়ালেম। মানুষ নাকি! একখণ্ড পাথরের আড়ালে কিসের পায়ের শব্দ মর্মরিয়ে উঠল। এলোমেলো ছায়াও যেন দেখলেম। শুধু একটি মাত্র মুহূর্ত! তার পরেই সব স্বাভাবিক মনে হল। ত্রস্ত পদসঞ্চারে সে স্থানটুকু আমি পেরিয়ে এলেম।

সামনের বাঁক ঘুরেই আমার ভয় ভেঙ্গে গেল। পরশুরামের মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। শঙ্খ ঘণ্টার সুমধুর ধ্বনিতে দু কান আমার ভরে গেল। মনে হল, মিথ্যা এতক্ষণ ভয় পেয়েছি। এই পবিত্র পর্বতের উপর ভয় পাবার মতো যে কিছু থাকতে পারে, এই মুহূর্তে তা ভুলে গেলেম। পথের প্রান্ত দিয়ে দেখলেম খানিকটা পশ্চিমের আকাশ। গলা সোনা ঝরে ঝরে পড়ছে তুঙ্গভদ্রার নীল স্রোতের উপর। পৃথিবী এত সুন্দর!

আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে মন্দিরের আলো দেখতে পেলেম। আলোয় আলোকময় হয়ে আছে মন্দির প্রাঙ্গণ। ঘৃতের প্রদীপ, বড় স্নিগ্ধ তন্দ্রালু আলো। স্পষ্টতর হল আরত্রিকের ধ্বনি। পুরোহিতের উদাত্ত স্তোত্রপাঠ যেন শুনতে পাচ্ছি। ভাস্করের কথা কি ভুলে গেলেম?

কই, ভুলি নি তো? আমার দৃষ্টি যে তারই সন্ধান করে ফিরছে। কিন্তু তাকে তো দেখছি নে।

মনে হল, কে আমায় আকর্ষণ করছে। দেহ নয়, আমার মন। ঐ আলোর দিকে, ঐ ধ্বনির দিকে, ঐ বুকভরা উদার আশ্বাসের

দিকে। কিন্তু কেন আমি যেতে পারছিনে। মনে হচ্ছে, তার চেয়ে বড় কিছু টানছে চারিপাশ থেকে। অন্ধকারের দিকে, নিস্তব্ধতার দিকে, অনিশ্চয়ে আচ্ছন্ন এক বুক ভয়ের দিকে। ভাস্করকে যে দেখতে পাচ্ছিনে। নাম ধরে তাকে ডাকতে পারি নে, চোখ দিয়ে তাকে খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু ভাস্করকে কোথাও খুঁজে পেলেম না। অন্ধের মতো মন্দির পরিক্রমা করলেম বার বার। পরশুরামের মূর্তির পশ্চাতে দেখলেম, দেখলেম দেবীর মূর্তির আড়ালে, বৃষগুলির চারিদিকও ঘুরে দেখলেম। আরও দূরে গিয়ে পূজারীদের ছায়াঘন আশ্রমও দেখে এলেম। কোথাও তাঁর দেখা মিলল না।

যাত্রীর ভীড় নেই মতঙ্গ পর্বতে। অল্প কয়েকটি নর নারী একত্র হয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ এক নারীকে দেখে চমকে উঠলেম। এই কি সেই দুঃস্থা নারী! একখানি শুভ্র বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করেও নিশ্চিন্ত হন নি, অবগুণ্ঠনের অন্তরাল রচনা করেছেন পরম যত্নে। চেনা যাচ্ছে না। কোথাও দেখেছি কিনা, তাও অনুমান করতে পারছি না। কিন্তু ভাস্কর যে এঁরই সন্ধানে এসেছেন, তাতে সন্দেহ রইল না। একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করেই সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হলেম। তাঁর চরণে চঞ্চলতা দেখেছি, আর আচরণে অস্থিরতা। দেবতার আরত্রিক তাঁর অন্তরকে অভিভূত করছে না।

ভাবলেম, আমিই কি এগিয়ে যাব? কিন্তু আমি গেলেও তো তিনি এগিয়ে আসবেন না। আমার হাতে যে রক্ত গোলাপ নেই! নাইবা থাকল! ভাস্কর দেবের কুশল প্রশ্নের জন্য রক্ত গোলাপের প্রয়োজন কেন হবে!

কিন্তু—

কয়েকপদ অগ্রসর হয়েও ফিরে এলেম। অপরিচিতা নারীর সঙ্গে কথা কইব মন্দির প্রাঙ্গণে! আমার কি বুদ্ধি ভ্রংশ হল!

দেখলেম, তিনি আমায় লক্ষ্য করেছেন। যাত্রীর জনতা থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার হাতের দিকে তাকালেন প্রচুর আগ্রহ নিয়ে। তারপর মুখের দিকে চেয়েই হতাশ হলেন মনে হল। প্রাঙ্গণের আরও সব যাত্রীর দিকে আর একবার তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি সঞ্চালন করে জনতার সঙ্গে আবার মিশে গেলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেম।

ভাস্করের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি। দেখা হলে এমন করে কাউকে খুঁজতেন না। আর কর্তব্য কর্ম চুকে গেলে অকারণে অপেক্ষাও করতেন না এখানে। যে নারীকে এমন নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণেও আত্মগোপন করে আসতে হয়, তিনি যে সাধারণ নন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে ইনি? রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী কোনও বন্দীনি নারী?

তার আয়োজন তো কোন দেখি নি। মন্দির দ্বারে কদম্ব কুঞ্জের নিচে নেই সুবর্ণ শিবিকা, নেই স্বর্ণময় সজ্জাদীপ্ত বারবরদার দল। কাঠের দোলিকাও নেই কোন। প্রাসাদে লালিতা কন্যা এত পরিশ্রমে মতঙ্গ পর্বতে আসবেন পদব্রজে?

তারপরই ভাবলেম, উপায় কি! এ যে তাঁর গোপন অভিসার! প্রেমের নয়, প্রাণের। প্রাণ যদি বেঁচে থাকে, তবে সেই প্রাণে হয়তো প্রেমের সঞ্চার হবে একদিন। আজ শুধু প্রাণ, প্রাণরক্ষা, দস্যুর কবল থেকে আত্মোদ্ধার!

ব্রাহ্মণদের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ কানে এল—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

"মধু বহন করছে বাতাস। মধুক্ষরণ করছে নদী ও সিন্ধু। ওষধি বনস্পতি মধুময় হোক, রাত্রি মধুময় হোক, উষা মধু হোক, মধুমৎ হোক পৃথিবীর ধুলি। সূর্য মধুমান হোক।"

ঘৃতের সুগন্ধ আসছে, আসছে ধূনক ও গুগগুলের সৌরভ। মন আমার কূলে কূলে ভরে গেল। আমি এগিয়ে গেলেম।

মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেম মনে পড়ে না। আরতি শেষ হলে প্রাঙ্গণে নেমে এলেম। নেমে আসতেই ভাস্করের কথা মনে পড়ল। কোথায় গেলেন ভাস্কর? ক্ষত্রিয়ের সঙ্কল্প নিয়ে স্বেচ্ছায় তো তিনি তাঁর আদর্শচ্যুত হবেন না। তবে কি তাঁর কোন বিপদ হল? কিন্তু তিনি শক্তিমান যুবক। তাঁকে কাবু করা তো একজনের কাজ নয়। তিনি পথভ্রষ্ট হন নি তো? এ ভাবনাও হল একবার। বিদেশী মানুষ, এদেশে নূতন মানুষ তিনি। মতঙ্গ পর্বতে আসতে পথ ভুলে হয়তো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? নগরের যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যে এই পর্বত দেখতে পাই! এ পথ তো ভুল হবার নয়!

কী ভাবছেন এমন গভীর ভাবে?

পিছনে প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেম। চেয়ে দেখি মন্দিরের পূজারী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শুভ্র শ্মশ্রু পক্ক কেশ বার্ধক্যভার-নত জ্ঞানি ব্রাহ্মণ। আরতি শেষ করে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রাঙ্গণে নেমেছেন।

সহসা আমার মুখে কোন উত্তর জোগাল না।

একজন তরুণ ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধ বললেনঃ মায়ের আরতিটা আজ তুমি কর, আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেনঃ আসুন।

বৃদ্ধকে অনুসরণ করবার আগে আমি চারিদিক একবার দেখে নিলেম। সেই কন্যাকেও আর দেখতে পেলেম না। ভিড়ের ভিতর মিলিয়ে যান নি, স্পষ্টই বুঝতে পারলেম যে সকলের অজ্ঞাতসারেই সরে পড়েছেন। এ যে ইচ্ছাকৃত তাতে সন্দেহ নেই। মনে হল, আমাকেও ফাঁকি দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু কে এই কন্যা?

সে কথা ভাববার সময় পেলেম না। সুযোগও পেলাম না তাঁকে ভাল করে খুঁজে দেখবার। বৃদ্ধের নির্দেশে তাঁকে অনুসরণ করে আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেম।

অন্ধকার তখন গভীর হতে শুরু করেছে। স্তব্ধ হয়ে আছে চারিদিকের পৃথিবী। আকাশে আর পাখার শব্দ নেই, শ্রান্ত পাখি তার নীড়ে আশ্রয় নিয়েছে। কালকের সকাল পর্যন্ত তার কাকলী আর শুনতে পাব না।

বৃদ্ধ একখানি মৃগচর্ম বিছালেন তাঁর কুটীরের অলিন্দে। বললেন : সন্ধ্যার বাতাসে হিমের আমেজ লেগেছে। খোলা আকাশের নিচে বসা দুঃসাহসিকতা হবে।

হেসে বললেম : সে বয়স আপনি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন দীর্ঘদিন।

প্রসন্নমুখে বৃদ্ধ বললেন : আপনারও উচিত হবে না।

তার এই অভ্যর্থনায় আমার মনে হল, তিনি আমার পরিচয় জানেন। তা না হলে যাত্রীর জনতার ভিতর থেকে আমায় ধরে আনতেন না। এ প্রশ্ন করা সঙ্গত হবে কি না, আমি ভাবছিলেম। আমার মনের কথা ধরতে পেরে বৃদ্ধ বললেন : আপনাকে জানলেম কোথা থেকে, এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন তো?

আমার বিস্ময় বাড়বার কথা। পরিচয়টা বাহিরের, তা জানা কঠিন নয়। কিন্তু আমার মনের কথা জানলেন কী করে? সত্যকথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা হল না। বললেম : হচ্ছি বৈকি। শুধু যে আমার পরিচয়ই জেনেছেন তা নয়, আমার মনের কথাটিও ধরতে পেরেছেন।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে আমার বিস্ময়টুকু উপভোগ করলেন, তারপর বললেন : আপনি মাধব বিদ্যারত্ন, রাজকুমারী গায়ত্রীর শিক্ষাগুরু। আজ কোনও পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য এই মন্দিরে এসেছিলেন। তাই নয়?

আমার বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই। নিরুত্তরে নিজের দৃষ্টি দিয়ে সেই বিস্ময় ব্যাপ্ত করে দিলেম।

বৃদ্ধ হেসে বললেন: আপনার উদ্বেগ আর বাড়াব না। আমি জ্যোতিষী নই, জাদুও জানিনে। আপনার পরিচয় পেয়েছি আমার এক শিষ্যের কাছে। কাল সকালে সরকারী ঘোষণায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রুর গুপ্তচর বন্দী করেছেন কোন নির্ভীক নাগরিক, অথচ তিনি এমন নির্লোভ ও নির্বিকার যে নিজের পরিচয় পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। রাজা পুরস্কার দিতে চান, কিন্তু তা গ্রহণ করবার লোক নেই। সেই মানুষটি দেখবার জন্য আমার এক শিষ্য কাল রাজসভায় যায়। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে আনে। আপনাকে দেখেই সে চিনতে পেরেছে এবং চুপি চুপি আমার দৃষ্টি আপনার প্রতি আকর্ষণ করেছে। বাকিটুকু আমার অনুমান। আর এই অনুমানের পিছনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে বলে অনেক সময়েই তা নির্ভুল হয়।

তা সত্যি।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েছি কী ভেবে জানেন?

জানিনে তো।

বৃদ্ধ বললেন: রামরাজার গুপ্তচরে পূর্ণ এই বিজয়নগর। তাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যারা এই নগরে প্রবেশ করল, তাদের সংবাদ আপনি পেলেন কোথা থেকে?

হেসে বললেম: এও আমার অনুমান।

আশ্চর্য হয়ে বৃদ্ধ বললেন: বিজয়নগরে শত্রু প্রবেশ করছে, এ আপনি অনুমান করেছিলেন?

আগের মতো হেসেই জবাব দিলেম: ঠিক তা নয়। অন্ধকারে এক যবনকে দেখে আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। সেই অনুমান আমার সত্যে পরিণত হয়েছে।

আরও কিছু জানবার জন্য বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি তাঁর কৌতূহল লক্ষ করে সেদিনের গল্প বললেম। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন অনেক কথা। সব কথার উত্তর আমার জানা ছিল না, যতটুকু জানি অসঙ্কোচে বললেম।

গল্প শেষ হলে বৃদ্ধ বললেন : আপনার কী মনে হয় বলুন তো?

আমি সত্যি কথাই বললেম : কী সম্বন্ধে বুঝতে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ বললেন : এই সম্বন্ধেই। এত অসংখ্য গুপ্তচরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নগরে প্রবেশ করা কি শত্রুসৈন্যের সম্ভব?

বললেম : গুপ্তচরের কাজকর্মের কথা আমি কিছু জানি না।

পরম বিস্ময়ে বৃদ্ধ অভিভূত হলেন, বললেন : গুপ্তচরের কথা আপনি জানেন না? আশ্চর্য।

এ কথার কী উত্তর দেব?

বৃদ্ধ বললেন : না, আশ্চর্য কিসের! কতদিনই বা আপনি এসেছেন! আর—

বৃদ্ধ নীরব হলেন।

বললেম : আর?

ইতস্ততঃ করে বৃদ্ধ বললেন : আপনি জ্ঞানি লোক। কারও সঙ্গে মেশেন না বলেই আমরা শুনেছি।

আপনাদেরও গুপ্তচর আছে বুঝি?

আমি হেসে প্রশ্ন করলেম।

বৃদ্ধও হাসলেন, বললেন : সন্দেহ করি বৈকি। বিজয়নগরে কে গুপ্তচর আর কে নয়, সে যে কে জানে, আমি তা জানিনে। আপনাকে আমি সত্যি কথা বলছি, মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় যে, আমার শিষ্যদের মধ্যেও হয়তো গুপ্তচর আছে। রামরাজার পয়সা খেয়ে এই মন্দিরের খবরাখবর সরবরাহ করছে। ব্রাহ্মণ সন্তান এ ঘৃণ্য কাজ করবে না, এই আমার বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলে—

একটা নিবিড় বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁর কণ্ঠরোধ হল।

একটু সময় নিয়ে বললেন : আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, এ নগরে আমরা গুপ্তচর পরিবৃত হয়ে আছি।

বৃদ্ধ অত্যন্ত ধীরে কথা বলছিলেন, অত্যন্ত মৃদুস্বরে। এবারে আরও সাবধানে বললেন : আপনিও সতর্ক থাকবেন।

বলে তাঁর চারিদিকের অন্ধকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলেন।

আকাশে চাঁদ দেখছিনে, কিন্তু একটা স্বচ্ছ আলোয় পৃথিবীটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মায়ের আরতি তখনও শেষ হয় নি। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ধূপের সৌরভও যেন পাচ্ছি। নিজে কথা না বলে আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকেই কথা বলার অবকাশ দিলেম।

দেশে এমন অবস্থা কেন এল বলতে পারেন?

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

বললেম : জানিনে তো?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন : আমাদেরও আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে। আমি নিজেও ভাবছি কিছুদিন থেকে। আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় জেগেছে আমাদের, নিজেদের লোকের উপরেই আমরা আস্থা হারিয়েছি। বিশ্বাসের অভাবে মানুষ সতর্ক হয়, আর ভীরু হয় শক্তির অভাবে। শুধু দেহের নয়, মনোবলের অভাবও মানুষকে দুর্বল করে। কিন্তু কেন?

অস্ফুট স্বরে বৃদ্ধ যেন নিজেকেই এই প্রশ্ন করলেন। নিজেই আবার উত্তর দিলেন, বললেন : স্বেচ্ছাচার বুঝি অত্যাচারের পর্যায়ে উঠেছে। রাজার সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করেও তৃপ্ত হন নি, এবারে রাজ্যটাকেই আত্মসাৎ করে নিশ্চিন্ত হতে চান। তালিকোটের যুদ্ধে জয়লাভ হলে মহারাজ সদাশিব রায়কে এই যুদ্ধজয়ের কঠিন মূল্য দিতে হবে। বিজয়নগর তাঁকে পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলেম অন্য কথা ভেবে। নিজের শিষ্যদের ভিতর গুপ্তচর আছে বলে যে ব্রাহ্মণ সদা শঙ্কিত থাকেন, তিনি

একজন অজ্ঞাত অপরিচিত লোককে কোন্ সাহসে এত কথা বলছেন তাঁর অর্বাচীন শিষ্যের নিকট আমার যে পরিচয় পেয়েছেন, সে তো আমার বাহিরের পরিচয়। আমিও যে রামরাজার চর নই, সে বিষয়ে কী করে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ হাসলেন, বললেন: আমি বৃদ্ধ হয়েছি। সত্য কথা বলতে আমি আর ভয় পাইনে। অভ্যাসেরও দোষ হয়েছে। মনের কথা এখন আর গোপন রাখতে পারিনে। বয়স মানুষকে বাচাল করে।

এ কথা আমিও শুনেছি, বিশ্বাসও করি। তাই সে দিনের পত্রবাহিকা সেই বৃদ্ধার আচরণে বিস্মিত হয়েছিলেম। অনেক চেষ্টা করেও ভাস্কর তার কাছ থেকে কোন কথাই সংগ্রহ করতে পারেন নি।

মহারাজ সদাশিব রায়ের কথা শুনে আমার কৌতূহল জেগেছিল। বললেম: মহারাজাকে কেন রাজ্য ত্যাগ করতে হবে তা বুঝলেম না।

বৃদ্ধ বললেন: স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগের নজির অল্পই আছে। মহাভারতের মতো বিরাট গ্রন্থে ভীষ্মের মতো, চরিত্র মাত্র একটিই। আমি বলছিলেম, সদাশিব রায় রাজ্যচ্যুত হবেন। রামরাজা দেশব্যাপী যে জাল বিছিয়ে রেখেছেন, তাতে প্রথম শিকার তিনি নিজে না হলে মহারাজাকে বিদায় নিতে হবে বৈকি! সে দিন হাজরা রামস্বামী মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা এখানে এসেছিলেন, তাঁদের মুখে অনেক কথাই জানতে পারলেম।

একটু থেমে বললেন: আপনি তো রাজঅন্তঃপুরে যান, আপনি জানেন না কিছু?

আমি ভয় পেলেম তাঁর কথা শুনে। আকাশের কান আছে, বাতাসের আছে শব্দ। প্রতিটি ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগে। এই চর-পরিবৃত দেশে কিছু বলা কি আমার সঙ্গত হবে? তবু উত্তর দিলেম, বললেম: সেখানে তো এসব আলোচনা হয় না।

তা বটে।

বলে বৃদ্ধ নীরব হলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন : বিজয়নগরে কান্না এখন গুমরে উঠছে। করভারে পীড়িত নাগরিক মুখ বুজে কাঁদছে। চেঁচিয়ে কাঁদলে শ্বাসরোধ করে তার কান্না বন্ধ করা হবে। বিজয়নগরের ক্ষেতে যে আর সোনা ফলছে না, সরকারের দৃষ্টি নেই সেদিকে।

আশ্চর্য হয়ে বললেম : এত জাঁক জমক—

কথার মাঝখানেই বৃদ্ধ বললেন : সব ফোঁপরা হয়ে গেছে। সমস্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে যুদ্ধের খাতে। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য সহ্য করেছেন নিজের অপমান। আজ সেই রাজ্যের মন্ত্রী দেশের সমস্ত অর্থ ব্যয় করে শত্রু সৃষ্টি করছেন। বাকী টাকা ব্যয় হচ্ছে শুধু রাজার নয়, মন্ত্রীরও বিলাস-ব্যসনে।

একটু দম নিয়ে বললেন : আরও কিছু শুনতে পাচ্ছি, তা সত্য কিনা জানি না! রামরাজার ভাইরা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের জন্য বিজয়নগরের অর্থ সরিয়ে রাখছেন।

মতঙ্গ পর্বতের উপর থেকে সমস্ত নগরটি স্পষ্ট দেখা যায়। এ সমস্ত ঘটনাও কি জানা যায় এখান থেকে? আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

বৃদ্ধ বললেন : ভাবছেন, কেমন করে আমরা এত জানলেম?

আমি আরও আশ্চর্য হলেম।

বৃদ্ধ বললেন : আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের বরাদ্দে টান পড়ায় কৌতূহলী হয়ে আমরা এসব সংগ্রহ করেছি। পয়সার অভাবে দেবতার খরচ কমানো হয়েছে।

মহারাজা এসব খবর জানেন?

তা জানিনে। তবে জানা উচিত ছিল, এইটুকুই জানি। রাজ্যের রাজা হয়ে—

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে বৃদ্ধ থেমে গেলেন, বললেন: আরতি শেষ হল?

শিষ্যেরা কয়েকজন এসে বৃদ্ধকে ঘিরে বসল। একজন উত্তর দিল: আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাদেরই ভিতর একজনকে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন: এই ছেলেটি আপনার সকল তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে।

যুবকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেম। সরল ঋজু দেহ, বর্ণ গৌর, বুদ্ধির দীপ্তি তার দৃষ্টিতে। নমস্কার করে বলল: যদি অপরাধ না নেন, তা হলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করব।

হেসে বললেম: অপরাধ নেওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম নয়, সকলের সকল প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই ব্রাহ্মণের জন্ম। তুমি নির্ভয়ে প্রশ্ন কর।

যুবক বলল: কাল রাজসভায় প্রথম আপনাকে দেখলেম। রাজপথে শত্রুর গুপ্তচর বন্দী করেছিলেন আপনি একা, অথচ সে গৌরবটুকু দিতে চেয়েছিলেন অন্যজনকে।

সরস্বতীকে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি, আরও কতজনকে দিতে হবে জানিনে। সত্য গোপনের চেষ্টা না করে বললেম: সম্প্রতি আমার এক বন্ধু এখানে এসেছেন, তাঁর রাজানুগ্রহের প্রয়োজন ছিল।

অপরিসীম শ্রদ্ধায় যুবক আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল: বুঝেছি। আপনার অনুরোধে সম্মত হয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলতে পারলেন না। তিনি মহান।

ব্যস্তভাবে বৃদ্ধ বললেন: কই, তাঁকে তো দেখছিনে।

বিদ্যুতের মতো তীক্ষ্ণ স্পর্শে আমি জেন আবার চেতনার জগতে ফিরে এলেম। কই তাকে তো দেখছিনে! কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়ে আঘাত করল এই কথা কয়টি। তাকে তো দেখছিনে!

যুবক আমায় লক্ষ্য করছিল। বলল: আপনি বিচলিত হচ্ছেন!

বললেম: সত্যই হচ্ছি। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলেম, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলেম না।

আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধ বললেন: হয়তো আসেন নি, আসতে পারেন নি।

আমার মন সে কথা মানল না, বললেম: তিনি যে কথা দিয়েছিলেন আমায়।

বৃদ্ধ তবু আমাকে নিশ্চিন্ত হবার যুক্তি শোনালেন। বললেন: হয়তো কোন প্রয়োজনীয় কাজে আটকা পড়েছেন, কিংবা অন্যত্র গেছেন জরুরী কাজে।

সে যে সম্ভব নয়, সে কথা আমি জানি। কিন্তু সে কথা এদের বলতে পারিনে। তাই দুর্ভাবনা জেগে রইলো মনের কোণে।

জনৈক শিষ্য বলল: যাত্রীদের কাছে আমি একটা সংবাদ পেয়েছি।

সবাই আমরা কৌতূহলী হলেম। আমাদের উদ্বেগ লক্ষ্য করে সেই শিষ্যটি বলল: মন্দিরের খানিকটা নিচে বাঁকের কাছে দু-একজন যাত্রী একটা আর্তনাদের শব্দ পেয়েছিলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পান নি।

আমিও ভয় পেয়েছিলেম সেইখানে। চেঁচিয়ে উঠলেম: কখন্ বলতে পার?

সূর্যাস্তের একদণ্ড পূর্বে।

আমি আমার আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিলেম। বললেম: একটা আলোর ব্যবস্থা কর, আমি খুঁজে দেখব।

সশিষ্য বৃদ্ধও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যস্ত ভাবে বললেন: এই অন্ধকার রাত্রে—

বললেম: অন্ধকারেই দেখব। প্রভাতের অপেক্ষা করলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।

সেই যুবকটি ছুটে গেল মন্দির প্রাঙ্গণে, বোধ হয় আলোর সন্ধানে। তার পিছনে আমিও বেরিয়ে এলেম আশ্রম থেকে।

॥ সতেরো ॥

তরুণ ব্রাহ্মণেরা অনেকে আমার সঙ্গে এগিয়ে এলেন। আঁতি পাঁতি করে খুঁজলেম বাঁকের কাছটা। তারপর আরও একটু নেমে গেলেম।

সহসা এক ব্রাহ্মণ কুমারের চিৎকারে আমার দেহের রক্ত হীন হয়ে গেল। একটা পাদুকা পাওয়া গেছে। ছুটে এসে দেখলেম, আমারই পাদুকা বটে। এই পাদুকা পায়ে দিয়ে ভাস্কর আজ যাত্রা করেছিলেন।

সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আমি শুধু মাথা দুলিয়ে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেম। ভয়ে ভাবনায় পাণ্ডুর হয়ে গেল তাদের গৌর মুখগুলি।

পাহাড়ের খাদ এখানে গভীর নয়। অসমতল জমি পথের এক-ধার থেকে আর একধারে নেমে গেছে স্তরে স্তরে। হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়তে পারে, কিন্তু গড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। বড় বড় প্রস্তর খণ্ড স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে, আছে লতা-গুল্মের ঝোপ, ও ছোট বড় বৃক্ষের ছায়া। সবই আমরা খুঁজে দেখলেম। কোনখানেই ভাস্করের সন্ধান মিলল না।

ততক্ষণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও নিচে নেমে এসেছেন। সমস্ত খবর শুনে ভাবলেম খানিকক্ষণ। তারপর সান্ত্বনা দিলেন, বললেন: মৃত্যু-ভয় এখানে নেই। তবে—

তবে কী?

আমি ব্যস্ত হলেম।

বৃদ্ধ একবার চারিধারটা দেখে নিলেন, তারপর চিন্তিতভাবে

বললেন। তবে কোনও বিপদ যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে, কোনও রাজপুরুষের কীর্তি। আপনার বন্ধু কি কোন রাজ-কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন?

এ কথার সত্য উত্তর আমি দিতে পারি না। দেওয়া উচিত হবে না। তাই উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেম: কোথায় তাঁর অন্বেষণ করি বলুন?

বৃদ্ধ কী বুঝলেন জানি না, বললেন: বড় মুস্কিল প্রশ্ন। সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করে থাকাই সঙ্গত মনে হচ্ছে। রাজপুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিরাপদ হবে না।

আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবছিলেম।

আপনার বন্ধু কি ব্রাহ্মণ?

তিনি ক্ষত্রিয়।

অনেকগুলো চোখ একসঙ্গে তাদের প্রশ্নের দৃষ্টি মেলে ধরলেন আমার চোখের উপর। আমি আরও কিছু না বলে পারলেম না। বললেম: ভাস্কর দেব আমার শৈশবের সাথী, দেবগিরির পাঠশালায় আমরা সহপাঠী ছিলেম। দীর্ঘদিন পরে এখানে আমাদের নূতন পরিচয় হল।

বৃদ্ধ বললেন: বুঝতে পেরেছি। ক্ষত্রিয় বলেই তাঁর গতিবিধি শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করা হচ্ছে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আরও কোনও রহস্য আছে এর ভিতর। তালিকোটে প্রতিবেশী মুসলমান সুলতানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, বিদেশী ক্ষত্রিয় যুবক এসেছেন নগরের ভিতর—উঁহুঁ।

বলে বৃদ্ধ তাঁর মাথা নাড়লেন।

আমার অদ্ভুত লাগছিল এই মানুষটিকে। বললেম: তবে?

আরও একটু চিন্তা করে বৃদ্ধ বললেন: বিরোধ রাজনীতির নয়, মনে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আমার আর অপেক্ষা করার সাহস ছিল না। কী কথায় কী কথা উঠে পড়ে তার ঠিক নেই। শেষে হয়তো পরিত্রাণ পাবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। বললেম: আজ আমায় বিদায় দিন, মন আমার অস্থির হয়ে উঠেছে।

বিদায় দেবার সময় বৃদ্ধ বললেন: সেই ভাল, আজ রাতে আপনি বিশ্রাম করুন। অনর্থক অন্বেষণ করে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না।

তথাস্তু বলে আমি এগিয়ে গেলেম। সশিষ্য পূজারী ব্রাহ্মণ ফিরলেন আশ্রমের দিকে।

খানিকটা অগ্রসর হয়েই আমায় থামতে হল। আলো নিয়ে পিছন থেকে কে যেন ছুটে আসছে। কাছে এলে দেখলেম, সেই ব্রাহ্মণ যুবকটি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: আপনাকে এগিয়ে দিতে এলেম।

আমার জন্য কেন কষ্ট করবে? আকাশে তো জ্যোৎস্না আছে।

কষ্ট কিসের! আর আপনাকে নিচে পৌঁছে দিয়ে এলে আমাদেরও নিশ্চিন্ত লাগবে।

তার আন্তরিকতাটুকু ভাল লাগল। বললেম: কিন্তু একা ফিরতে তোমার যে কষ্ট হবে।

যুবক হেসে উত্তর দিল: ওঠা নামায় আমাদের অভ্যাস আছে।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ অতিক্রম করার পরে যুবকটি আবার কথা কইল। বলল: আমাদের গুরুদেবের বড় সংশয়ী মন। তাই তাঁর সামনে একটা কথা গোপন রেখেছিলেম। হয়তো আপনার সে কথা কাজে লাগবে।

আমার কাজে লাগবে?

হ্যাঁ, আপনার কাজে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, ভাস্কর দেবের সঙ্গে এ ঘটনার কোনও যোগাযোগ আছে।

ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ আছে! আমি চমকে উঠলেম। উৎকর্ণ হলেম তার পরবর্তী কথার জন্য।

আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে যুবক বলল : আজ মন্দির প্রাঙ্গণে এক কন্যাকে দেখেছি। অত্যন্ত অস্থির ভাবে কাউকে অন্বেষণ করছিলেন।

কন্যা!

যুবক বলল : হ্যাঁ, কোনও অপরিচিতা কন্যা। আপন পরিচয় গোপন রাখবার জন্য অবগুণ্ঠনে আবৃতা হয়ে এসেছিলেন।

তুমি চেন তাঁকে ?

চিনিনে। আর চিনিনে বলেই সন্দেহ করছি। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেককেই আমরা চিনে ফেলেছি। আর যাঁরা নূতন, তাঁরা এমন একাকী আসেন না।

একটু থেমে বলল : সত্যি কথা বলতে কি, এমন পর্দার প্রয়োজন কারও দেখি নি।

তুমি কি সন্দেহ কর ?

আমি!

একটু ইতস্তত: করে বলল : আমার মনে হয়—

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে প্রশ্ন করলেম : কী মনে হয়—

যুবক বলল : আমার অনুমান ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।

সঙ্কোচ করছ কেন ?

যুবক বলল : ভাস্কর দেব বোধহয় এঁরই সাক্ষাতে আসছিলেন। আর এই জন্যই তাঁর বিপদ হয়েছে।

অদ্ভুত দৃষ্টি এই যুবকের। তার বুদ্ধিও অদ্ভুত। আমি অভিভূত হলেম। খানিকটা সামলে নিয়ে বললেম : একটা কথা আমি বুঝতে পারছিনে। কোনও কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতে এলে বিপদ কেন হবে ?

চিন্তিত ভাবে যুবকটি বলল : তা ঠিক। তবে ঘটনাটা যত সরল আমরা ভাবছি, ঠিক ততটা নয়। উনি যে সামান্যা কন্যা নন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ঐ কন্যাকে বাধা দিতে না পেরে রাজপুরুষেরা ভাস্কর দেবকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। আমার আরও

কিছু সন্দেহ হচ্ছে। কাল অনুসন্ধান করে আমি আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।

ততক্ষণে আমরা পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছে গেছি। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাকে বিদায় দিলেম।

যুবককে বিদায় দিলেম বটে, কিন্তু দুর্ভাবনাকে বিদায় দিতে পারলেম না। একা পেয়ে আরও যেন চেপে ধরল। নিজের কথা ভুলে গেলেম। ভাস্করের ভাবনাতেই মন ভরে গেল।

কোথায় তাঁর সন্ধান পাব! এত বড় সহর বিজয়নগরে কোথায় তাঁর খোঁজ করতে যাব? গৃহের দিকে পা গেল না, ঘুরে ঘুরে বাজারে এলেম।

এই সেই বাজার! ভাস্কর বলছিলেন, এখানে তিনি মানুষ চিনতে আসেন। এখানে মানুষের সঙ্গতির পরিচয়, তার ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও সচ্ছলতার সংবাদ, তার সমাজের আর্থিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি। অন্যমনস্কভাবে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেম। কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পেলাম না। ক্রেতার ভিড় নেই, বিক্রেতারা অলসভাবে বসে আছে। কেউ আলাপ করছে পাশের বিক্রেতার সঙ্গে। উজ্জ্বল বিপনীগুলিও সব ফাঁকা। ক্রেতার অভাবে সমস্ত স্থানটা যেন থমথম করছে।

ভাস্কর বলছিলেন, বিজয়নগরের পতন যে অবশ্যম্ভাবী, এ সংবাদ তিনি এই স্থানে সংগ্রহ করেছেন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে পদচারণা করে আমার শ্রান্তি এল দেহে, তবু কোনও কিছুর হদিস খুঁজে পেলেম না।

এক সময় মনে হল, এ আমি কী করছি! ভাস্কর যে আশ্রমে ফিরে আমার অপেক্ষাতেই বসে নেই তাই বা কে জানে! সত্যিই কী মূর্খ আমি! শৃঙ্গেরী মঠে আমার আচার্য যে আমায় মূর্খ বলতেন, সে কথা যে কত বড় সত্য, তা এখন বুঝতে পারছি। আমি আশ্রমের দিকেই ছুটে চললেম।

রাত তখনও গভীর হয় নি। নগর তবু নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে দোকান পাট। আলোয় ও কলরবে যা জেগে আছে, তা সাধারণ রঙ্গালয় আর প্রমোদভবনগুলি। হাসির হররায় কেঁপে কেঁপে উঠছে কাচের সার্শিগুলো। সেখানে আমি দাঁড়ালেম না। আরও জোরে জোরে পা ফেলে সেই উন্মত্ত পল্লীটা পেরিয়ে এলেম।

ভাস্কর কি সত্যই আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন! ছি, ছি, কী লজ্জার কথা! ক্ষুধা তৃষ্ণায় হয়তো বেচারা কাতর হয়ে পড়েছেন। তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়লেও ব্রাহ্মণের গৃহে কোন কিছু স্পর্শ করার অধিকার তাঁর নেই। কেন আমি এমন নিষ্ঠুর হলেম! কেন মুর্খ হলেম!

আরও জোরে পা চালিয়ে চললেম আশ্রমের দিকে।

॥ আঠারো ॥

অনেক আশা নিয়ে গৃহে ফিরেছিলেম। কিন্তু ভাস্করকে পেলেম না। এইটেই হয়তো স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমার দুর্ভাবনার ধারা বইছিল আশার খাতে। তাই স্বপ্নভঙ্গের মতো কঠিন আঘাত পেলেম।

রাতে ঘুম হল না। জেগে জেগে শীতের রাত্রির স্তব্ধ সঙ্গীত শুনলেম। নিঃশব্দ সঙ্গীত। মনের কান দিয়ে কিছু কিছু শোনা যায়। গৃহের উপরে ঝরছে হিমশীতল শিশিরবিন্দু, ঝরে পড়ছে শ্যাম দুর্বাদলের উপর। সেই শিশিরের আঘাতে ঝরছে আমের মঞ্জরী। সকালের বাতাস আকুল হবে তার সৌরভে।

মনে হল, বাহিরের অন্ধকারে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কান পেতে শুনছে ঘরের স্পন্দন। মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। কারা ওরা? আমার গতিবিধিও তারা কেন লক্ষ্য করছে? আমি তো কোনও অন্যায় করি নি? ভাস্করকে আশ্রয় দিয়েছি, সে কি আমার অন্যায়? কেন অন্যায় হবে? রাজ্যচ্যুত রাজকুমার এসেছেন বিজয়নগর রাজ্যের সাহায্য ভিক্ষায়। এই সাহায্য পেলে তাঁর খড়গ উঠবে মুসলমান বাদশাহের উপর। শত্রুতার জন্য এ রাজ্যে তো তিনি আসেন নি।

তবে কি নারীকে রক্ষা করা এ দেশে ধর্ম নয়?

বাহিরে হঠাৎ কী যেন মর্মরিয়ে উঠল। চমকে উঠলেম। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে অলিন্দে বেরিয়ে এলেম।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় আকুল হয়ে আছে আমার অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ।

কাছে ও দূরে কোথাও কিছু দেখতে পেলেম না। শির শির করে খানিকটা বাতাস বয়ে গেল। শুকনো পাতার উপর জেগে উঠল মর্মর ধ্বনি।

রাত্রি প্রভাত হতে আর দেরি নেই। স্নানাহ্নিকে বেরবার জন্য আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। পৃথিবী জেগে উঠলে ভাস্করেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। মনটা প্রসন্ন হল। ঘরে ফিরে আর ঘুমোবার চেষ্টা করলেম না।

পৃথিবীটা এক সময় জাগল। পাখির কাকলীতে তার সংবাদ পেলেম। সমস্ত স্নায়ু একত্র করে এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা যেন করছিলেম। কমণ্ডলু হাতে আবার বেরিয়ে এলেম। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাত্রা করলেম তুঙ্গভদ্রার তীরের দিকে।

পথের উপর অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হতে শুরু করেছে। সূর্যোদয়ের আর বেশি বিলম্ব নাই। বুঝতে পারলেম, ক্লান্ত চোখে কখন এক সময় ঘুম নেমে এসেছিল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের জন্যই ব্রাহ্ম মুহূর্তটি উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি।

নদীর ঘাটে তখন ব্রাহ্মণেরা সবাই পৌঁছে গেছেন। স্নান সেরে আহ্নিকে মন দিয়েছেন অনেকে। সন্ধ্যা বন্দনায় আমিও মনোনিবেশ করলেম।

আমার মন বড় উদ্‌ভ্রান্ত ছিল। নিত্যকার মতো আহ্নিকে আজ মনোযোগ দিতে পারছিলেম না। জল থেকে উঠে যাবার সময় পাশের ব্রাহ্মণেরা যে কথা বলছিলেন তা আমার কানে গেল। একজন বললেন: প্রধান রাজপথের পাশে একজন ব্রাহ্মণকে পড়ে থাকতে দেখলেম অচেতন অবস্থায়।

আর একজন বললেন: আমিও দেখেছি, তবে ঘুমে অচেতন মনে হল।

মনে হল, সুরাপানে মত্ত হয়েছিলেন। অনভ্যাসের জন্য গৃহে ফিরতে পারেন নি।

বিচিত্র নয়। সাধারণ প্রমোদাগারের দ্বার থেকে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

আমি তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু এখনও তাঁর মত্ততা দূর হয় নি।

একজন তৃতীয় ব্রাহ্মণ আলাপে যোগ দিলেন, বললেন: প্রমোদালয়ে ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন সুরাপান করতে! ধর্ম অনেকদিন গেছে তা মানি, কিন্তু লাজ লজ্জা লোকাপবাদ, এ সবও কি উৎসন্নে গেল?

কোথা থেকে কে একজন মন্তব্য করলেন: কলি, কলি, ঘোর কলি!

আমি নিশ্চিন্ত হলেম, তিনি ভাস্কর ছাড়া আর কেউ নন। প্রমোদালয়ের কথা কাল তিনি আমাকে বলেছিলেন। সেখানে তিনি মানুষের সত্য পরিচয় পান, সেখানেই তিনি দেবতার অন্বেষণ করেন। তার পরেই মনে পড়ল তাঁর ব্রাহ্মণ-বেশের কথা। ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তার সম্মান রক্ষা করতে পারলেন না।

আমার সন্ধ্যা শেষ হল না। আমি আর কাল বিলম্ব না করে প্রধান রাজপথের দিকে ছুটলেম সেই হতভাগ্যের সন্ধানে। রাগে আমার সারা শরীর রি রি করতে লাগল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! প্রধান রাজপথের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত খুঁজেও ভাস্করকে আবিষ্কার করতে পারলেম না। অন্য কোন মানুষকেও দেখলেম না পথের পার্শ্বে। কোথায় গেলেন ভাস্কর!

তাহলে কি সংজ্ঞালাভ করে আশ্রমেই ফিরে গেলেন! কাঁচা সোনার মতো সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে পথের উপর। উদ্যানের পত্র-পুষ্পে সেই সোনা ক্ষণে ক্ষণে ঝিকমিক করছে। মনে হল, এই

রশ্মির স্পর্শে তিনিও তাঁর চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন। আর লোক-লজ্জার ভয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করেছেন। আমি আমার আশ্রমে ফিরে এলেম।

অঙ্গনের কূপের নিকটে জলের শব্দ হচ্ছিল, স্নানের শব্দ। বুঝতে ভুল হল না যে ভাস্কর তাঁর সারা রাত্রির গ্লানিটুকু ধুয়ে ফেলে নির্মল হবার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে বাধা দিতে গেলেম না। বাহিরে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলেম অধীর ভাবে।

শুষ্ক বস্ত্রে সারা দেহ আবৃত করে ভাস্কর যখন বাহিরে এলেন, তখনও আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। গম্ভীর ভাবে বললেম: বস।

আম্র বৃক্ষের বাঁধানো বেদীর উপর আমি বসেছিলেম। ভাস্কর নিঃশব্দে আমার পাশে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বললেন না।

কী বলে শুরু করব, আমি সেই কথা তখন ভাবছিলেম। ভাস্কর হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লেন। গভীর গলায় বললেন: তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না মাধব?

উত্তর না দিয়ে আমি শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকালেম।

আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে বললেন: তুমি নিশ্চয়ই আমায় ভুল বোঝ নি!

তাঁর সন্দেহের কথা আমি বুঝতে পারি। আমার আচরণে কোন উদ্বেগ না দেখেই তিনি বিচলিত হয়েছেন। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন: বল, তুমি আমায় ভুল বোঝ নি, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।

আগে তোমার অপরাধের কথা শুনি।

ভাস্কর এবারে অন্য কথা বললেন: কী করে আমি সেই কন্যার কাছে মুখ দেখাব।

কান্নার মতো করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

যা ঘটেছে সব খুলে বল।

ভাস্কর নিজেই সব বলতেন। এবারে ভূমিকা ছেড়ে বিগত দিনের কাহিনীটুকু বিবৃত করলেন। বললেন: কাল পরশুরামের মন্দিরে পৌঁছতে তখনও খানিকটা পথ বাকী ছিল। হঠাৎ দুজন দস্যু দুদিক থেকে এগিয়ে এসে আমায় সরিয়ে ফেলল। পরিস্থিতিটা অনুমান করতে গিয়ে দেখলেম, আমার চোখ ও মুখ দুইই বাঁধা। কিছু দেখতেও পাচ্ছি না, কথা কইবারও আর উপায় নেই। শুধু এইটুকু অনুভব করতে লাগলেম যে দস্যুরা উঁচু নিচু অসমতল পথ দিয়ে আমায় নিচে বয়ে আনল। চোখ মুখের বাঁধন যখন খুলে দিল, দেখলেম, আমি এক প্রমোদালয়ের সুসজ্জিত কক্ষে স্থান পেয়েছি। কয়েকজন ধনী নাগরিক আমাকে ঘিরে বসে নানা রকম উপহাস করতে লাগলেন। সবচেয়ে অসহ্য বোধ হল একটি তরুণী নটীকে। সে আমার কোমর থেকে ছোরাখানি বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখাতে লাগল। বলল, ব্রাহ্মণেরাও আজকাল অস্ত্র ব্যবহার করছে। তারপর একপাত্র সুরা এগিয়ে দিয়ে বলল, চলবে না কি? অপমানে ও ঘৃণায় আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলেম। সেই নটী আমায় টেনে বসিয়ে দিল, বলল, সে হবে না ঠাকুর, এটুকু তোমায় খেতেই হবে। বলে সেই পান পাত্র আবার এগিয়ে দিল। আমি কী করতে যাচ্ছিলেম মনে নেই। চারিপাশের নাগরিকেরা আমায় চেপে ধরলেন, আর সেই নটী নিঃশেষে সেই পানীয়টুকু আমার মুখের ভিতর ঢেলে দিল। প্রতিবাদ করবার অবসর আমি পেলেম না।

খানিকটা দম নিয়ে ভাস্কর আবার গল্প শুরু করলেন, বললেন: তারপর সব এলোমেলো হয়ে গেল। সেই সুরার মধ্যে কী ছিল জানিনে, এক পাত্রেই আমি মাতাল হয়ে গেলেম। তারপর কী করেছি, কী বলেছি, কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ছে তাদের কয়েকটি উপদেশের কথা। বিদেশী মানুষ আমি, এ রাজ্যের ব্যাপারে যেন অযথা মাথা না ঘামাই! তাহলে বিপদ হবে।

তার পরের ঘটনা আমি জানি। ভাস্কর সে কথা সমর্থন করলেন।

বললেন : যখন জ্ঞান হল, দেখলেম, পথের ধারে শীতে জমে আছি। বেদনায় সারা দেহ টনটন করছে।

ভাস্কর এবারে অনেকক্ষণের জন্য থামলেন। তারপর বললেন : তার চেয়েও বেশি টনটন করছে আমার মন। ক্ষত্রিয় হয়ে আমি হেরে গেলেম। সেই দুঃস্থা নারীকে আমি রক্ষা করতে পারলেম না।

পারলেম না ব'লো না, বল পারি নি। তবে রক্ষা করবার সঙ্কল্প যখন গ্রহণ করেছ, তখন আবার সুযোগ খুঁজতে হবে।

হতাশ ভাবে ভাস্কর বললেন : তাকি পাব? মতঙ্গ পর্বত থেকে ফিরে গিয়ে সেই কন্যা কি আমায় কাপুরুষ বলে ঘৃণা করতে শুরু করেন নি! আবার কি তিনি পত্র দিয়ে আমন্ত্রণ করবেন! আমি তো তাঁর পরিচয় জানিনে। আমি তো পারব না আমার সঙ্কল্পের কথা তাঁর কানে পৌঁছে দিতে।

আমি কী ভাবলেম জানিনে, বললেম : তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমায় সাহায্য করব।

শিশুর মতো সরল মুখ তুলে ভাস্কর আমার দিকে তাকালেন। আমি আবার তাকে আশ্বাস দিলেম : আমি তোমায় সাহায্য করব।

॥ উনিশ ॥

ভাস্করকে আমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেম বটে, কিন্তু নিজের মনে খুব বেশি ভরসা পাচ্ছিলেম না। কেন জানি না, রাজকন্যা গায়ত্রীর কথা তখন আমার মনে পড়েছিল। ভেবেছিলেম, সরস্বতীর কাছে এ রহস্যের সন্ধান পাব। অধ্যয়নে গিয়ে তার কাছেই সব কথা জেনে নিতে পারব।

চেষ্টাও করেছিলেম। অন্তঃপুরে প্রবেশের সময় নিজের দৃষ্টি রেখেছিলেম সজাগ। প্রত্যহের মতো সরস্বতীই অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখেই আমি তাকে প্রশ্ন করতে চাইছিলেম। ওষ্ঠের উপর তর্জনী চেপে সরস্বতী আমায় থামিয়ে দিল। কিন্তু কথা কইল না। মনে হল, একটা থামের আড়ালে কে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজকন্যা কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। প্রসন্ন মুখে ঘরে এসে আমাকে প্রণাম করলেন। আমি তাঁকে আশীর্বাদ করে আপন আসনে উপবেশন করলেম। রাজকন্যা বসলেন পরে, অদূরে তাঁর দর্ভাসনে।

আর একবার রাজকন্যাকে দেখলেম। স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে সে মুখ। কিন্তু কেন জানি না, এই হাসি দেখে আজ আমার আনন্দ হল না। বরং ভয় হল, ভাবনা হল। খানিকটা অস্থিরতাও বোধ করলেম।

রাজকন্যাও বোধ হয় আমার এই ভাবটুকু লক্ষ্য করলেন। তাই কোনও প্রশ্ন না করে আমাকে সুস্থ হবার অবকাশ দিলেন।

আমি রাজকন্যার কথাই ভাবছিলেম। ভাস্করের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা। আমার মন বলছে যে সেই দুঃস্থা নারী রাজকন্যা ছাড়া অন্য কেউ নন। আর সরস্বতীই তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনা করেছে। সরস্বতীর আচরণে এই সন্দেহ আমার বারবার সমর্থিত হচ্ছে। কিন্তু সবই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে রাজকন্যার ব্যবহারে। মনের মধ্যে যার তুফান বইছে, তার বাহিরটা এমন প্রশান্ত হয় কী করে। সেদিন সকালে খানিকটা অস্থিরতা দেখেছিলেম সত্যি! সে তো শত্রুর গুপ্তচরের অন্তঃপুর প্রবেশের জন্য। রাজকন্যা কেন, অন্তঃপুরের সকলেই সেদিন নানা আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছিলেন।

কাল প্রভাতের কথা মনে পড়ল। পিতার অপ্রকৃতিস্থতার জন্য রাজকন্যা অনুতপ্ত বোধ করেছিলেন। ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা দেখেছি, আর শুনেছি তাঁর অন্তরাত্মার গভীর আকুতি। সে ভোগের নয়, ত্যাগের। সে ক্ষত্রিয়ের সশব্দ আয়োজন নয়, ব্রাহ্মণের নীরব উপাসনা, দেহের দাবী বিস্মৃত হয়ে আত্মার সাধনা, মুক্তির সন্ধানে সুন্দরের আরাধনা। রাজকন্যা কি তাঁর মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন! তাইতেই বুঝি প্রসন্ন দেখছি তাঁকে।

কিন্তু—

অপরাহ্নের কথা আমার মনে পড়ল, ভাস্কর দেবের অসাফল্যের কথা। তবে কি সেই পরিকল্পনার সঙ্গে রাজকন্যার জীবন নেই জড়িয়ে! তা যদি থাকত, তবে তাঁকে এমন প্রসন্ন দেখছি কেন! রাজকন্যা কি তাঁর জীবনের দামের কথা একেবারে ভুলে গেলেন!

অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন রাজকন্যা নিজে। বললেন: গুরুদেবকে আজ বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে।

আমি চমকে উঠলেম তাঁর কথা শুনে। বলে ফেললেম: তাই কি?

কঙ্কণের শব্দ পেলেম দ্বারের কাছ থেকে। দেখলেম সরস্বতী এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টিতে দেখতে পেলেম সতর্ক হবার আদেশ। চকিতে আত্মসম্বরণ করে বললেম: আজ কী পড়াব, সেই কথাই ভাবছি!

রামায়ণ কি আজ পড়াবেন না?

বললেম: আমার কী মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে, রামায়ণে তোমার অনুরাগ নেই। অধ্যয়ন তো বড় কথা নয়, অধ্যয়নে অনুরাগই হল বড় কথা। তোমাকে পড়াবার দায়িত্ব দিয়ে আমার আচার্যদেব যখন শৃঙ্গেরী মঠ থেকে আমায় পাঠালেন, তখন তিনি এই উপদেশই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, অধ্যাপকের প্রধান কাজ হল শিষ্যের প্রাণে অধ্যয়নে অনুরাগ সঞ্চার করা। এই কাজ যিনি পারেন, তিনিই সার্থক অধ্যাপক। তাঁর নশ্বর দেহ একদিন ভস্ম হবে, কিন্তু শিষ্যের প্রাণে অধ্যয়ন প্রীতি জেগে থাকবে চিরকাল।

আমি থামতেই রাজকন্যা বললেন: আজ এ কথা কেন ভাবছেন গুরুদেব?

সঙ্গত কারণেই ভাবছি। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমার অধ্যয়ন শুরু হয়েছে ব্যাকরণ দিয়ে। গুরুগৃহে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছি। তারপর মনুর ধর্মশাস্ত্র, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎসায়নের কামশাস্ত্র। শিক্ষার এই রীতি। ভাল লাগা না লাগার প্রশ্ন কোনদিন উঠে নি।

আপনার বন্ধু কি আপনাকে কিছু বলেছেন?

রাজকন্যা কী ভাবছিলেন জানি না, হঠাৎ এই প্রশ্নটি আমায় করে বসলেন।

চট করে আমি উত্তর দিতে পারলেম না।

রাজকন্যা বললেন: তিনি ক্ষত্রিয় রাজকুমার। অধ্যয়ন অধ্যাপনা তাঁর ভাল না লাগবারই কথা।

না, ঠিক তা নয়।

আমি ইতস্তত করছিলাম সত্য কথা বলতে।

রাজকন্যা কৌতূহলী হলেন, বললেন : কী বললেন তিনি ?

তাঁর আগ্রহ দেখে আমাকে বলতেই হল। বললেম : ভাস্কর বলেন, রামায়ণ শৈশবের কাব্য, তার রসবোধ হবে পরিণত বয়সে। রসোচ্ছল যৌবনে তার আদর নেই।

অকস্মাৎ রাজকন্যার দুই গণ্ড আরক্ত হল। সেই রক্তের স্পর্শ লাগল তাঁর কর্ণমূলেও। রাজকন্যা কি লজ্জা পেলেন ?

আমি তাঁর কাছে একটা উত্তরের আশা করেছিলেম। ভেবেছিলেম, ভাস্করের মন্তব্যটা রাজকন্যার মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেব। কিন্তু তিনি অধোবদনেই রয়ে গেলেন। কোন কথাই কইলেন না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললেম : ভাস্কর বলেছেন, রামায়ণ ছেড়ে কালিদাস ধরতে, কালিদাসের মেঘদূত বা ঋতু সংহার। যদি নাটক ভাল লাগে তো শকুন্তলা বিক্রমোর্বশী বা মালবিকাগ্নিমিত্র। ভবভূতির মালতি-মাধব বা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকেও তাঁর আপত্তি নেই।

এ সব বই কি রাজকুমার নিজে পড়েছেন ?

রাজকন্যার প্রশ্নের ভিতর আমি একটা শ্রদ্ধার ইঙ্গিত পেলেম।

পড়েছেন বলেই তো মনে হল। তা না হলে বেছে বেছে এই সব বই-এরই বা নাম করছেন কেন ?

একটু স্মরণ করে বললেম : সেদিন এই রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় কী বলেছিলেন জান ?

রাজকন্যা সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললেন : মেঘদূতের উত্তর মেঘ লেখবার আগে মহাকবি কালিদাস বিজয়নগর দেখেছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মহাকবি কালিদাস তো অতি প্রাচীন কবি বলে শুনেছি।

বললেম : প্রাচীন বটে। কিন্তু বাল্মীকির মতো প্রাচীন নন।

ভাস্কর অন্য কারণে এই প্রশ্ন করেছেন। প্রাসাদসংলগ্ন সরোবরে ক্রীড়ারত মরাল মিথুন দেখে মেঘদূতের কথা তাঁর মনে পড়েছিল। মেঘদূতেও এমনি একটি বাপীর উল্লেখ আছে।

রাজকন্যার দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হল।

বললেম ঃ রাজকুমার শুধু বীরই নন, কবিও বটে।

কথাটি বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেম। আমার কাছে ভাস্করদেব তাঁর কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু বীরত্বের পরিচয় দিতে এখনও বাকি আছে। নিজের ভুল তাই সংশোধন করে নিলেম, বললেম ঃ এখন তাঁর আত্মগোপনের পথে শক্তি সঞ্চয়ের সময়। তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। যেদিন সফল হবেন, সেদিন তাঁর বীরত্বের খ্যাতি সূর্যের আলোর মতন দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে।

আমি থামতে পারলেম না, বললেম ঃ আমরা দেবগিরির অধিবাসী। আজ আড়াইশো বছর আমরা পরাধীন হয়ে নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছি। দেবগিরির ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয় মহারাজা রামচন্দ্র দেবের আমলে। তাঁর আগে যত কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ অত্যাচার উৎপীড়ন সবই সীমাবদ্ধ ছিল বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে। দক্ষিণ ভারতের ঐশ্বর্যের সংবাদ দিল্লীতে অবিদিত ছিল না। কিন্তু বিন্ধ্য অতিক্রম করবার সাহস ছিল না কারও। দেবগিরির দরজায় প্রথম হানা দিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। এই আক্রমণের জন্য মহারাজ রামচন্দ্রদেব প্রস্তুত ছিলেন না। ইলিচপুর প্রদেশের সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে দেশরক্ষা করলেন। কিন্তু কর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কর দিলেন না। আর কিছুদিন পর গুজরাটের রাজ্যচ্যুত রাজা কর্ণদেবকে নিজের রাজ্যে আশ্রয় দিলেন। এই অপরাধে এলেন আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর। মহারাজ রামচন্দ্রদেব হেরে গিয়ে আবার বশ্যতা স্বীকার করলেন। সে আজ দুশো আটান্ন বছর আগের কথা। কিন্তু তাঁর পুত্র শঙ্করের ধমনীতে ছিল উষ্ণ

রক্ত। ছয় বৎসর বিদ্রোহ করে সম্মুখ সমরে তিনি নিহত হলেন। আর একবার যুদ্ধ হয়েছিল দেবগিরিতে। মহারাজ রামচন্দ্রদেবের জামাতা হরপালের সঙ্গে আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবউদ্দীন মোবারক শাহের। শঙ্করের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আলাউদ্দীন খিলজীর মৃত্যু হয়। লোকে বলে, ক্ষমতালোভী মালিক কাফুর বিষ-প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু বিধাতা বাধ সাধলেন। সুলতানের শিশুপুত্রকে শিখণ্ডী খাড়া করে রাজ্যভোগের বাসনা কাফুরের পূর্ণ হল না। তিনি মারা গেলেন। এই অরাজকতার দিনে হরপাল দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশভক্তির যে দণ্ড পেয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কুতবউদ্দীন জীবন্তে তাঁর দেহের চামড়া তুলে তাঁকে মেরে ফেললেন।

ভয়ে রাজকন্যা তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। শিহরে উঠলেন সেই নৃশংস অত্যাচারের দৃশ্য কল্পনা করে।

বললেম ঃ এই যাদব বংশের ছেলে ভাস্করদেব। এঁর ধমনীতেও সেই দেশাত্মবোধের রক্ত। দেশকে ভালবাসেন নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি।

রাজকন্যা আবার চাইলেন উজ্জ্বল চোখে। বললেম ঃ আমি জানি গায়ত্রী, আমাদের জন্মভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে পারবেন ভাস্করদেব। সামান্য একখণ্ড ভূমির অধিকার নিয়ে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারছেন না। সমস্ত দেবগিরির অধিকার তাঁর চাই। এ তাঁর উত্তরাধিকার। মহারাজ সদাশিব রায়ের কাছে সামান্য অর্থসাহায্য পেলেই ভাস্কর তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করবেন।

রাজকন্যা উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখে আজ নতুন আলো দেখলেম। হঠাৎ মনে হল, পিছনের দ্বারে শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে আছে। মুখ ফেরাতে গিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তার সতর্কতার কথা তখনি মনে পড়ল। ভাস্করের কথায় আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেম। নিজেকে সামলে নিলেম।

রাজকন্যা বললেন : গুরুদেব, আলাউদ্দীন খিলজীর নামে আমার আর একটি কথা মনে পড়ছে। কাল মা আমাকে পদ্মিনীর উপাখ্যান শোনালেন। বললেন, সত্যি-মিথ্যার কথা তিনি জানেন না। শুনেছেন যে সুলতানের কাছে তাঁর স্বামী পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু সেই মহিয়সী নারী কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করলেন না। জহরব্রতের আগুনে মেবারের সমস্ত নিষ্কলঙ্ক নারী হাসতে হাসতে পুড়ে মরলেন।

রাজকন্যার চোখে আমি সেই আগুন দেখলেম। মনে হল, এক রাত্রির জন্যই তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে রেখেছেন। মিথ্যা হতে পারে পদ্মিনীর কাহিনী, কিন্তু সেই জহরব্রতের আগুন তো মিথ্যা নয়। চরম অসম্মান থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভারতের নারী বুঝি যুগে যুগে এই ব্রত উদ্যাপন করেছেন। সতীদাহের চিতায় বুঝি জহরব্রতেরই আগুন জ্বলছে। আমি মুগ্ধ নেত্রে তাকালেম রাজকন্যার দিকে।

রাজকন্যা তাঁর মাথা নত করলেন। প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ থেকেই তাঁর এই প্রসন্নতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলেম। এবার তার কারণ বুঝতে পারলেম। মনে হল, তাঁর পরিত্রাণের পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

॥ কুড়ি ॥

আজ আমাদের কিষ্কিন্ধ্যা পরিক্রমার কথা। কিন্তু ভাস্করদেব উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। আমি বললেম : আজই তো আমাদের পরিক্রমার দিন। ভগবান রামচন্দ্র এখানে সীতার অন্বেষণে এসেছিলেন, আজ আমরাও অন্বেষণে বেরব।

কেন জানিনা ভাস্কর হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলেন। আহারান্তে বিশ্রাম না করেই পথে নামলেন।

আমি এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললেম : আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত বিরহী রাম চতুর্মাস্য উদযাপন করেছিলেন এই মাল্যবান গিরিতে।

আমার মনও প্রফুল্ল হল। মনে হল কিষ্কিন্ধ্যাই তো ক্ষীরোদ সমুদ্র। নারায়ণ এখনও এখানে অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়ে আছেন। বললেম : চল, প্রথমে মতঙ্গ পর্বতে যাই। এই মতঙ্গ পর্বতের সামনে পম্পা নদী তীরেই রামচন্দ্র হনুমানের দর্শন পান।

ভাস্কর বললেন : এই নদীর নাম তো তুঙ্গভদ্রা !

বললেম : এই নদীরই নাম ছিল পম্পা। আরও খানিকটা উত্তরে পম্পা সরোবরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। আজ আর পম্পা সরোবরের সঙ্গে তুঙ্গভদ্রার যোগ নেই। সরোবর আজ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে।

মনে পড়ল, রামচন্দ্রের বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। বনবাস সম্পূর্ণ হতে আর মাত্র এক বৎসর বাকি আছে। মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী

তিথির বিন্দু মুহূর্ত পঞ্চবটী বন থেকে সীতা অপহৃত হলেন। সীতার অন্বেষণে এসেছেন রাম লক্ষ্মণ। মতঙ্গ পর্বতে তখন সানুচর সুগ্রাবের বাস।

বললেম: জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালির বড় স্নেহভাজন ছিলেন সুগ্রাব। একসঙ্গে মিলেমিশে রাজ্য শাসন করতেন। হঠাৎ সুগ্রীবের উপর কেন বিমুখ হলেন জান?

ভাস্কর বললেন: বাল্যকালে পড়েছিলেম। এখন আর স্মরণ নেই।

বললেম: বাল্যকালে রামায়ণ সকলেই পড়েন। কিন্তু তার রস গ্রহণের বয়স হবার আগেই তা ভুলে যান। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়মই অনুসৃত হয়ে আসছে দেখে তোমাকে এসব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করছি।

ভাস্কর বললেন: রামায়ণ পাঠ আমার নেশা নয়, পেশাও নয়। তাই এই অজ্ঞানতার জন্য লজ্জিত হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।

বললেম: মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুই দানব সহোদর মহিষের রূপ ধারণ করে। মায়াবী বালিকে আক্রমণ করলে বালি তাকে বধ করবার জন্য তার অনুসরণ করে পাতালে প্রবেশ করেন। সুড়ঙ্গের মুখে রেখে যান সুগ্রীবকে। এক বৎসর অপেক্ষার পর সুগ্রীব সেই সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন। বালির পথ রোধ করবার জন্য নয়, বালি নিহত হয়েছেন ভেবে দানবদের পথ বন্ধ করবার জন্য সুগ্রীব এই কাজ করেন। আরও এক বৎসর পর বালি ফিরে এসে দেখেন, সুগ্রীব বসেছেন কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে। রোষে অন্ধ হয়ে বালি সুগ্রীবকে বধ করতে চাইলেন। ভয়ে সুগ্রীব গিয়ে আশ্রয় নিলেন এই মতঙ্গ পর্বতে।

কিষ্কিন্ধ্যাতেই এই মতঙ্গ পর্বত। সুগ্রাব কোন্ সাহসে বালির

এত নিকটে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন, ভাস্কর তাও ভুলে গেছেন। বললেম : বালি যখন মায়াবীর ভ্রাতা দুন্দুভিকে বধ করেন, সেই রাক্ষসের রক্ত পড়েছিল মতঙ্গ ঋষির দেহে। ঋষ্যমূক পর্বতে তিনি তপস্যারত ছিলেন, ক্রোধভরে অভিশম্পাত করলেন যে এই পর্বতে এলেই বালির মৃত্যু হবে। সুগ্রীব তাই মহানন্দে আছেন ঋষ্যমূক পর্বতে।

আজ আর মতঙ্গ ঋষি নেই। আজ তাঁর নামেই পর্বতের নাম। পর্বতের উপরে আছেন কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত একটি মন্দির। তাতে পরশুরামের মূর্তি, একটি দেবীর মূর্তি, আর তিনটি বৃষের। মধ্যাহ্নের পূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে এখন আর কাউকে দেখতে পেলেম না। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেম : এ ভালই হল।

ভাস্কর বললেন : তোমার বিদ্যাকেন্দ্র কই ?

হেসে বললেম : গড়ে তুলতে হবে। যে পর্বতে আশ্রম নির্মাণ করে ঋষি মতঙ্গ তপস্যা করে গেছেন, সে স্থান তো পরম পবিত্র। এই স্থানের অধিকার পেয়ে আমি আজ কৃতার্থ মনে করছি।

ভাস্কর মুগ্ধ হলেন চারিদিকের দৃশ্যাবলী দেখে। বললেন : ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি বিজয়নগরকে। এমন সুন্দর নগরীও হয় পৃথিবীতে।

তুঙ্গভদ্রা দক্ষিণ পশ্চিম থেকে প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর পূর্বে। তারই দুদিকে গড়ে উঠেছে সপ্ত প্রাচীর ঘেরা বিজয়নগর। দক্ষিণের ভূখণ্ডই ঐশ্বর্যময়। নদীর তটপ্রান্ত থেকে উঠেছে রাজার মর্মর প্রাসাদ। তার ভিতর হাজারা রামস্বামীর মন্দির, দেওয়ানখানা, ঘণ্টাঘর, পদ্মমহল, হাতীশালা। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাথরের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে তুঙ্গভদ্রার জল আসছে শহরে। কৃষিক্ষেত্রের

ভিতরেও যেন এমনি পয়ঃপ্রণালী দেখতে পাচ্ছি। সবচেয়ে রমণীয় দেখাচ্ছে বিঠোবা বিঠল স্বামীর মন্দির। বিশাল তার প্রাঙ্গণ, বিরাট তার ব্যবস্থা। মনে হচ্ছে, এটিই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নগরী।

ভাস্কর জিজ্ঞাসা করলেন: কত আয়তন হবে এই নগরীর?

বললেম: বিদেশীরা এর পরিধি বলেছেন ত্রিশ ক্রোশ। আমার মনে হয়, নদীর দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য তিন চার ক্রোশের কম হবে না। নগরীর দক্ষিণে মাল্যবান গিরির দিকে আমি ভাস্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেম। বললেম: চল এবারে আমরা মাল্যবান গিরিতে যাই।

পথ চলতে চলতে অনেক কথা হল। বললেম: এই মাল্যবান গিরিকে প্রস্রবন গিরিও কেউ কেউ বলেন। একদিন দুদিন নয়, দীর্ঘ চারমাস এই পর্বতে বাস করেছেন সানুজ রামচন্দ্র। বালিবধের পরেই দুরন্ত বর্ষা শুরু হল। আকাশ ভেঙ্গে যেন জল পড়ছে। খরস্রোতা পম্পা হল ভয়াবহ। ফুলে গর্জে দুকূলে আছড়ে চলল। সাধ্য কার, প্রকৃতির এই পাগলামি উপেক্ষা করে সীতা অন্বেষণে বার হয়। রামচন্দ্র চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করলেন। বর্ষাশেষে সুগ্রীব বিশ্বস্ত বানরদের পাঠালেন চারিদিকে। সীতাহরণের দীর্ঘ দশমাস পর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লানবমীতে সীতার সন্ধান পাওয়া গেল জটায়ুর জ্যেষ্ঠ সম্পাতীর কাছে। একাদশীর রাতে হনুমান লঙ্কায় পৌঁছলেন, সীতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল শেষ রাত্রে। সপ্তমীর দিন রামচন্দ্র সীতার সংবাদ পেলেন হনুমানের মুখে। তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন পরের দিন উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রের বিজয় মুহূর্তে। সূর্যদেব তখন মধ্যাকাশে।

ভাস্কর আশ্চর্য হয়ে বললেন: এত তিথি নক্ষত্রের হিসেব পেলে কোথায়? রামায়ণে তো এই সব পাই নি!

বললেম: পদ্মপুরাণে। শুধু রামায়ণ পড়লেই কি রামায়ণ পড়া সম্পূর্ণ হয়! মূলের চেয়ে তার টীকা ভাষ্যই বড়।

মাল্যবান গিরিতে আজ একটি প্রাচীন দেবালয় আছে। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা এই দেবালয়। তার প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে রামচন্দ্র ও সীতা দেবীর মূর্তি। মহারাজা এ দেবালয়ে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলের অভাব নেই এ পাহাড়ে। রাম-বাণ নামে একটি গভীর কূপ থেকে পানীয় জল উত্থিত হচ্ছে। প্রাচীরের বাহিরেও একটি জলাশয় আছে। তার নাম লক্ষ্মণ বাণ। লোকে এ জল পান করে না। পূজক ব্রাহ্মণ বললেন: রাম ও লক্ষণ এই পাহাড়ে অবস্থান কালে বাণ নিক্ষেপ করে পাতাল থেকে এই জল তুলেছেন। তা না হলে এত উঁচুতে এমন সুমিষ্ট জল কোথা থেকে আসবে?

এ সব বিশ্বাসের কথা। ভাস্কর বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না।

লক্ষ্মণ-বাণের নিকট এক গুহার ভিতর আমরা শিবলিঙ্গ দর্শন করলেম।

ব্রাহ্মণ বললেন: মতঙ্গ পর্বতের ন্যায় এ স্থান থেকেও বিজয়নগরের শোভা দেখা যায়।

বলে এক জায়গায় আমাদের নিয়ে এলেন। এখান থেকেও দেখলেম পর্বত বেষ্টিত বিজয়নগর।

বড় মনোরম স্থানটি। ভাস্করের ইচ্ছা করছিল খানিকটা বিশ্রাম করবার। আমি রাজী হলেম না। বললেম: তুঙ্গভদ্রার পারঘাট এখান থেকে ক্রোশ খানেক। পম্পা সরোবর সেখান থেকে এক ক্রোশের কম হবেনা। অঞ্জনা পাহাড় পম্পা সরোবর ও শবরীগুহা দেখে ফিরতে আমাদের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

ভাস্কর বললেন: একদিনেই সব শেষ করতে চাও ব্রাহ্মণ?

বললেম: এখনও সময় আছে। অনর্থক বিলম্ব না করলে আজই সব দেখা হয়ে যাবে।

ভাস্কর আপত্তি করলেন না। কিন্তু উৎসাহের চিহ্নও দেখলেম না তাঁর মুখে।

পাহাড় থেকে নামবার সময় জিজ্ঞাসা করলেম: পদব্রজে তোমার কষ্ট হচ্ছে কি?

ব্রাহ্মণের চেয়ে কষ্ট সহিষ্ণু হবে ক্ষত্রিয়, এই দুনিয়ার রীতি। কষ্ট হচ্ছে স্বীকার করতে ভাস্করের বোধ হয় লজ্জা হল। বললেন: কষ্টের কথা আমি বলছি না, বলছি প্রয়োজনের কথা। একদিনেই যদি সব দেখে ফেললেম, তা হলে বসে বসে করব কী!

বললেম: করবার অনেক কাজ পাবে। যুদ্ধের জয় পরাজয়ের সংবাদ আজ কালের মধ্যেই আসবে। পরাজয় ঘটে থাকলে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে, আর জয়ের সংবাদ এলে তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। দেবগিরি অধিকারের জন্য কিছু সেনা কি আর তোমার ভাগ্যে জুটবেনা?

খুশি হলেন ভাস্কর। বললেন: তুমি কি সত্যিই এতখানি আশা কর মাধব?

বললেম: আশা না করলে কি শুধু শুধুই তোমাকে আশা দিচ্ছি।

নিঃশব্দে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করলেম। আমার মন তখন ভগবান রামচন্দ্রের চিন্তায় ছেয়ে আছে। বললেম: মতঙ্গ পর্বতের কাছে চক্রতীর্থে যেতে ভুলে গেলেম। এই চক্রতীর্থেই শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের সাক্ষাৎ পান। এখন এই চক্রতীর্থে একটি ক্ষুদ্র দেবালয় নির্মিত হয়েছে। তাতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর মূর্তি। সেখানে গেলে পূজক ব্রাহ্মণেরা তোমাকে এই গল্প শোনাতে ভুল করবেন না।

ভাস্কর কোনও কথা বললেন না। আমি গল্প শোনাতে লাগলেম বিচ্ছিন্ন ভাবে: তুঙ্গভদ্রার এ পারে আরও একটি গ্রাম আছে, যা রামের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। সে গ্রামের নাম নিম্বপুর। একস্থানে যে অস্থির স্তূপ আছে, গ্রামবাসী বলে যে সে বালির অস্থি।

গল্পে গল্পে কখন আমরা এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে এসে পৌঁছেছি, তা খেয়াল করি নি। আজকের নদী নয় এই তুঙ্গভদ্রা। বিষ্ণু যখন বরাহের রূপ ধরে মর্তে এসেছিলেন, তাঁর ঘর্ম থেকে এই তুঙ্গভদ্রার উৎপত্তি। পারাপারের ব্যবস্থা আজকাল ভাল। বড় নৌকোর প্রয়োজন আমাদের নেই। দশ বারোজন যাত্রীর পারাপারের উপযোগী স্থানীয় টোকরায় আমরা নদী পার হলেম। টোকরা কাঠের নৌকো নয়, চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া বেতের হাল্কা তরণী। নির্ভয় হতে হলে খানিকটা সতর্কতার প্রয়োজন।

আনেগুন্দির দুর্গ ভাস্করকে দূর থেকেই দেখালেম। বললেম : বালির রাজত্বে এই দুর্গ ছিল না। এই দুর্গ নির্মাণ করেছেন হয়শাল-রাজ বীর বল্লাল।

আমরা পা চালিয়ে গেলেম চিন্তামনি আশ্রম। এ স্থানটির নামে মন আমার বিষাদে ভরে যায়। চাঁদের কলঙ্কের মতো রাম নামে কলঙ্ক লেগে আছে এইখানে। রামায়ণ অধ্যাপনার সময় আচার্যদেব বলতেন, বালি বধের রহস্য আমরা বুঝি না। আজও এ রহস্য আমি বুঝি নি। বালি ও সুগ্রীব দুই সহোদর ভ্রাতা। তারা যখন প্রকাশ্যভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত আছেন, রামচন্দ্র এই চিন্তামনি আশ্রমের এক নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থেকে শর নিক্ষেপে বালি বধ করেন। সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করে তাকে রাজত্ব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার জন্য যদি বালিকে বধের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তো তাকে সম্মুখ সমরে কেন আহ্বান করলেন না! কেন এই ছলের আশ্রয় নিলেন ভগবান রামচন্দ্র? আমার সমস্ত বিচার বুদ্ধি পরাস্ত হয়েছে এই রহস্যের উদ্ধারে।

আজ এই চিন্তামনি আশ্রমে ধনুর আকারে প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত হয়ে আছে এই স্থানটি। কিন্তু কাছে গিয়ে এক অদ্ভুত বেদনায় বুক আমার ভরে উঠল। ভাস্করকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে টেনে আনলেম।

এখানেও একটি দেবালয় আছে। তার মধ্যে চিন্তামনি দেবী ও মহাদেব বিরাজ করছেন। নিকটে দুইটি গুহাও আছে। তার একটির নাম রাম গুহা। আশ্রমের ব্রাহ্মণেরা এখানে প্রয়োজন মতো সাধন ভজন করেন।

আমরা পম্পা সরোবরের দিকে এগিয়ে গেলেম। পথের বামে পড়ল অঞ্জনা পাহাড়। অঞ্জনাপুত্র হনুমানের জন্ম এই পাহাড়ে।

পম্পা সরোবরের সে বিস্তার আর নেই। পম্পা নদী চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করে কাঙ্গাল করে গেছে এই পম্পা সরোবরকে। চারিদিকে পর্বত বেষ্টিত এর প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু তেমনি মনোরম আছে। জলে ফুটে আছে কুমুদ কহ্লার, হংস ও চক্রবাকে মুখর হয়ে আছে তটপ্রান্ত। ভারতের চারটি সরোবরের কথা কে বলেছিলেন, মনে করতে পারলেম না। সরোবরের নাম কিন্তু মনে এল। পূর্বে উৎকলের বিন্দু সরোবর, পশ্চিমে কচ্ছ দেশের নারায়ণ সরোবর, উত্তরে হিমালয়ের পারে মানস সরোবর, আর দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যায় এই পম্পা সরোবর। প্রাকৃতিক শোভায় এদের তুলনা নেই। মনে হল, যিনি এই কথা প্রচার করে গেছেন, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল কবির মতো। এদের আদর হয়তো একই রকম থাকবে যুগে যুগে।

ভাস্করের চোখ দেখলেম বৈজ্ঞানিকের মতো। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললেন: এই সরোবরকে অবিলম্বে রক্ষার ব্যবস্থা না করলে এর অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য মুছে যাবে।

আমিও বিচার করে দেখলেম, ভাস্কর ঠিকই বলেছেন। বাহির থেকে স্বচ্ছ জল টেনে না আনলে এই প্রাকৃতিক সরোবর একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে পরিণত হবে। বললেম: মহারাজ সদাশিব রায়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করবার প্রয়োজন আছে।

ভাস্কর বললেন: এখনও কেউ তা করেন নি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

সরোবর তীরে আশ্রমের কাছে আমরা শবরী গুহা দেখলেম। এই সেই শবরী গুহা, যেখানে বাস করে শবরী মতঙ্গ ঋষির সেবা করে গেছেন। প্রভুর মৃত্যুর পর অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দূর করে দিলেন অস্পৃশ্যা বলে। মৃত্যুর পূর্বে মতঙ্গ ঋষি বলেছিলেন, শবরী, তোমাকে দর্শন দিতে ভগবান রামচন্দ্র এই বনে আসবেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শবরী এই বন ছেড়ে বাদামীর নিকট অন্য এক বনে গিয়েছিলেন। সেই বনও শবরী-বন নামে পরিচিত।

সত্যকার প্রতীক্ষা করেছিলেন অস্পৃশ্যা শবরী। বনের মধ্যে যা কিছু ফলমূল পেয়েছিলেন, দেবতার ভোগের মতো তাই তুলে রেখেছিলেন প্রভু রামচন্দ্রের জন্য। যৌবন গড়িয়ে গেল প্রৌঢ়ত্বে, একদিন বৃদ্ধাও হলেন। মনের বিশ্বাস তবু গেল না। একদিন আসতেই হল রামচন্দ্রকে। সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে শবরীর সন্ধান পেলেন রামচন্দ্র। সে কি আনন্দের দিন শবরীর! অঞ্জলি ভরে সেই শুষ্ক ফল দিলেন প্রভুকে। রামচন্দ্র সেই ফল খেয়ে তাঁকে কৃতার্থ করলেন। বললেন: তুমি বর নাও শবরী।

শবরীর অন্তরে আজ অভাব নেই কোনও কিছুর। বললেন: দর্শন পেয়েছি প্রভু, সেই তো আমার বর। অন্য বরে আজ আমার প্রয়োজন নেই।

ভগবান রামচন্দ্র মুগ্ধ হলেন।

॥ একুশ ॥

ফেরার পথে আমাদের রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততা আর রইল না। শীতের ছোট বেলা, নিরুত্তাপ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছেন। কিন্তু অস্তমিত হতে এখনও অনেক বিলম্ব। ভাস্করের ভাল লাগছিল এই আবহাওয়াটি। বললেন: তাড়া যখন নেই, একটু ধীরে ধীরেই চলা যাক।

বললেম: সেই ভাল, অন্ধকার নামবার আগে তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে পৌঁছলেই আমাদের চলবে।

ভাস্কর বললেন: পথের পরিমাণ জানা হয়ে গেছে। প্রয়োজন বোধ হলে তাড়াতাড়ি পা চালানো যাবে।

কোথাও বসবে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর ভাস্করের ঠোঁটেই লেগে ছিল। বললেন: বসতে তো আসি নি ভাই, এসেছি দেখতে। দেখার জিনিস ভাল করে দেখে যাব।

ব্যস্ত ভাবে আমি বললেম: আর তো দেখবার কিছু নেই। সবই তো আমরা দেখে নিয়েছি।

ভাস্কর হাসলেন। বললেন: কিছুই দেখি নি। তোমার অঞ্জনা পাহাড় পম্পা সরোবর আর শবরী গুহাই তো বিজয়নগর নয়। ঐ সব মরা জিনিস দেখে বর্তমানের বিচার হয় না। তোমার আমার মতো বিজয়নগরেরও রক্ত মাংসের দেহ আছে, বুকের ভিতর তারও হৃৎপিণ্ড সারাদিন ধুক ধুক করে। সেই জীবন্ত বিজয়নগরকে আজও আমার দেখা হয় নি।

আমি আমার বিস্মিত দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর তুলে ধরলেম।

ভাস্কর বললেন : তুমি আশ্চর্য হচ্ছ, তাই না? কিন্তু ভেবে দেখলেই বুঝবে, আমি ঠিকই বলছি। রাজা আর মন্ত্রী নিয়ে রাজ্য নয়, মন্দির আর বিপণি নিয়েও নয়। রাজ্য তো প্রজাকে নিয়ে। সেই প্রজাদের দেখা এখনও আমার বাকি আছে।

সত্যি কথা! কিন্তু এর উত্তর দেবার আগে ভাস্কর নিজেই বললেন : এইখানেই আমরা ভুল করি। জ্ঞানী গুণী সবাই সমান ভাবে এই ভুল করি। কোনও দেশ দেখতে এসে দেখি তার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি, দেখি তার প্রাসাদ আর মন্দির, তার চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর, তার বাজার আর রঙ্গালয়। তার মানুষ দেখিনে। সেদিন আমি তোমাকে এই কথাই বলছিলেম। রাজ্যের মানুষের খানিকটা পরিচয় পেতে হলে মন্দির থেকে বাজারে যেতে হবে, বাজার থেকে প্রমোদালয়। এতো মানুষের সম্পূর্ণ রূপ নয়, এতো তার একটা খণ্ড রূপ।

সম্মুখে পথের দক্ষিণে কয়েকটি কুটির দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাস্কর বললেন : সত্য পরিচয় পেতে হলে ঐখানে কিছুদিন বাস করে যেতে হবে।

বললেম : এক সঙ্গে বাস করলেই কি মানুষের সত্য পরিচয়টা পাওয়া যায়?

ভাস্কর আমার কথা মেনে নিলেন, বললেন : হয়তো সব সময় যায় না। কিন্তু রাজ প্রাসাদে বাস করে যে প্রজার পরিচয় পাওয়া যায়না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হেসে বললেম : প্রজার পরিচয়ে আমার কী প্রয়োজন?

ভাস্কর একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন : তুমি ব্রাহ্মণ, দেবতার সাক্ষাৎ পেলে তোমার জীবন সার্থক হবে, তা মানি। তোমার সঙ্গে আমাকে জড়িও না। ক্ষত্রিয়ের কারবার মানুষ নিয়ে, মানুষ তার দেবতা।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেম।

ভাস্কর বললেন : আমি ঠিকই বলছি। মানুষ রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ের জন্ম, সেই জন্যেই তার মৃত্যুপণ। বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে দেহ রক্ষা করে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গলাভ হয় না, তার স্বর্গ সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করে।

চট করে এ কথার জবাব আমার মুখে এল না। ভাস্কর তা লক্ষ্য করে বললেন : প্রজার সুখ দুঃখ জানেনা যে রাজা, সে কি রাজা ! দস্যুর সঙ্গে তার তফাৎ কোথায় ! প্রজার কাছে কর বলে যা আদায় হবে, সে তো দস্যুর লুঠেরই নামান্তর।

ভাস্কর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, বললেন : আজ এদেশের রাজা যদি রাজার মতো আচরণ করতেন—

বাধা দিয়ে আমি বললেম : মহারাজার কোনও ত্রুটি দেখেছ তুমি ?

ত্রুটি নেই ! লক্ষ কোটি প্রজার ভার মন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে যিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাঁকে তুমি রাজা বলবে মাধব ? সমস্ত রকমের পার্থিব সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন যে বৌদ্ধ ধর্মীরা, তাঁরাও রাজ্যসুখের অন্য অর্থ করেছেন ! গ্রীসের রাজা মিলিন্দকে ভিক্ষু নাগসেন কী বলেছেন, তোমার কি মনে নেই ?

বললেম : আছে।

সে কথায় কান না দিয়ে ভাস্কর বললেন : রাজ্য পরিচালনার সঙ্গে তিনি জীবনের দুঃখ জ্বালার তুলনা করেছেন। সেই দুঃখ ভোগের পর রাজার রাজ্যসুখ, আর মানুষের নির্বাণ।

আমি হাসলেম। বললেম : রীতিমত দার্শনিক হবার চেষ্টা করছ যে !

ভাস্কর হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার ভাবালুতা উবে গেল কর্পূরের মতো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে আমার হাত টেনে ধরলেন। এক মুহূর্ত লক্ষ্য করে বললেন : কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

ব্যস্তভাবে চারিদিকে চেয়েও আমি কিছু দেখতে পেলেম না।

ভাস্কর বললেন : সেই বৃদ্ধাকে যেন দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধাকে : আমি কৌতূহলী হলেম : সেদিন সকালে যে তোমায় পত্র দিতে এসেছিল !

অন্যমনস্কভাবে ভাস্কর উত্তর দিলেন : বিজয়নগরে তো ঐ একজন বৃদ্ধার সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে।

তা বটে।

আমি এখনও কাউকে দেখতে পাই নি। পায়ের নিচের স্বল্প পরিসর পথ এঁকে বেঁকে তুঙ্গভদ্রার পারঘাটের দিকে চলে গেছে। অদূরে পথের দক্ষিণের সেই কুটীরগুলি তখন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি একটি শিশুকে দেখলেম, পথের উপর পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। এ যে ক্ষুধার কান্না তাতে সন্দেহ নেই।

ভাস্করের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেম তা স্থির হয়ে আছে একটি নারিকেল গাছের দিকে। একখানি কুটীরের গা ঘেঁষে উঠেছে নারিকেল গাছটি। তার গোড়ায় একটা মাটির স্তূপ। তারই উপর সেই বৃদ্ধা বসে আছে। পশ্চিম থেকে এক ফালি রোদ এসে ছড়িয়ে পড়ছে স্থানটুকুর উপর। আর দু হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে বসে বৃদ্ধা তাই উপভোগ করছে।

ভাস্কর আমাকে কাছে আকর্ষণ করে বললেন : এই বারে দেখতে পাচ্ছ ?

বললেম : দেহটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মুখ তো আড়াল আছে।

ভাস্কর বললেন : সেই জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি।

আমি হেসে ফেললেম। বললেম : মুখ না দেখেই তোমার পরিচিতা ভাবলে ?

অসহিষ্ণু ভাবে ভাস্কর বললেন : অত নির্বোধ ভেবোনা আমাকে। মুখ দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়েছি, নিশ্চিত হবার আগে আর একবার দেখে নিতে চাই।

একটু থেমে বললেন : জাতে ক্ষত্রিয় আমরা। শত্রু মিত্র একবার দেখলে চিনতে আর ভুল হয় না।

আমি আগের মতো হেসেই জবাব দিলেম : একটুখানি হয়। মিত্রকে শত্রু বলে সন্দেহ কর, আর শত্রুকে মিত্র ভেবে নিজের সর্বনাশ ডাক।

বৃদ্ধা যেন মুখ তুলবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে। ভাস্কর অধৈর্য হচ্ছিলেন। বললেন : একটা ছোট্ট ঢিল ছুঁড়ব ?

আমি হেসে ফেললেম!

রাস্তার ছেলেটির কান্না হঠাৎ থেমে গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখলেম, এক স্ত্রীলোক একটা বাটিতে করে কিছু খাবার তার হাতে দিয়েছে। কিন্তু সেই বাটির দিকে একবার চেয়েই ছেলেটির কান্না আবার সপ্তমে চড়ল। নির্দয় ভাবে নিজের ছোট পা দুখানা ঘষতে লাগল পথের ধূলার উপরে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে খাবার তার পছন্দ হয় নি।

ভাস্কর বললেন : মায়ের অবস্থা দেখ।

নীরবে আমি সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেম। আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মা সেই খাবারটুকু খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ভাস্কর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন : মহারাজ সদাশিব রায়ের কানে এ সংবাদ পৌঁছয় না ?

অকারণে তুমি রাগ করছ।

অকারণে ? তোমার কি মাথা খারাপ হল মাধব! যে রাজ্যে মায়েরা কাঁদে সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে না পেরে, তুমি ভাব সে রাজ্যের লক্ষ্মী আজও অচলা আছেন ?

আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করলেম না।

ভাস্কর বললেন : মিথ্যা আমি এখানে এসেছি। আজ সদাশিব রায় আমাকে কী সাহায্য করবেন! সাহায্যের প্রয়োজন আজ তাঁরই বেশি দেখছি।

ভাস্কর হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন : দেখছ!

দেখলেম, সেই বৃদ্ধাই বটে।

এবারে আমার বুদ্ধি দেখ।

বলে ভাস্কর এগিয়ে গেলেন।

কুটিরের সামনে পৌঁছে হাতে তালি দিয়ে ভাস্কর সেই বৃদ্ধাকে ডাকলেন: শোন!

ভূত দেখার মতো বৃদ্ধা চমকে উঠল। উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। অপ্রকৃতিস্থের মতো কেঁপে উঠেছিল তার পা দুখানা। উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এল পথের উপর।

ভাস্কর বললেন: একটা কথা শুনবে?

বলে কয়েকটা মুদ্রা বৃদ্ধার হাতে গুঁজে দিলেন।

সেই শীতল স্পর্শে বৃদ্ধার চোখ জোড়া ঝলমল করে উঠল। বলল: শুনবনা? নিশ্চয়ই শুনব।

ভাস্কর খুশী হলেন, বললেন: সে দিনের পত্রের একখানা জবাব দেব। যথাস্থানে তোমায় পৌঁছে দিতে হবে।

সাগ্রহে বৃদ্ধা তার দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে দিল ভাস্করের দিকে।

ভাস্কর বললেন: তৈরি নেই। একখণ্ড ভূর্জপত্র দাও, আর মসী লেখনী।

উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধা গেল কুটীরের অভ্যন্তরে। অল্পক্ষণেই পত্র লেখার সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এল। হাতের উপর ভূর্জপত্র রেখেই ভাস্কর কয়েক ছত্র লিখে ফেললেন। বললেন: এই নাও। আজই রাতে পৌঁছে দেবে।

তথাস্তু।

মাথা নেড়ে বৃদ্ধা তার সম্মতি জানাল।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলেম। ভাস্কর আবার ফিরে বললেন: যদি না পৌঁছতে পার, কাল তোমার সাজা মিলবে।

সেই সঙ্গেই হেসে যোগ করলেন: আর পৌঁছে দিলে পুরস্কার।

খানিকটা এগিয়ে আমি বললেম: কী লিখে দিলে?

দেখ নি বুঝি ?

ভাস্কর আমার মুখের দিকে চাইলেন।

বললেম: দেখবার অধিকার তো আমার নেই। জানবার কৌতুহল আছে বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

ভাস্করের চোখ মুখ থেকে খুশি উপচে পড়ছিল। বললেন: বুঝেছি। এসব তোমার নীতির কথা, শাস্ত্রের কথা, আমরা যা মানিনে জানিওনে।

তারপর নিজেই বললেন: সেই দুস্থা কন্যাকে লিখলেম, কাল এই সময় এইখানে অপেক্ষা করতে। আমিও দেখে নেব, তারা কেমন করে আমার পথরোধ করে।

আমার ভাল লাগল তার এই প্রতিজ্ঞাটুকু। তবু বললেম: তারা বাধা দেবেই। গায়ের জোরে তুমি তাদের সঙ্গে পারবে না।

আমার কথা শুনে ভাস্কর খুশি হতে পারলেন না, বললেন: পারি কিনা তুমি দেখে নিও।

আরও খানিকটা চলবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলেম: এই বৃদ্ধাটি কে, তুমি জানবার চেষ্টা করেছ কি ?

ভাস্কর তৎপর ভাবে উত্তর দিলেন: তাতো করি নি।

তাঁর কণ্ঠস্বরে যে খানিকটা উদ্বেগের আভাষ আছে, তা আমার কাছে গোপন রইল না। আমি আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেম না।

ভাস্কর বললেন: তুমি কি তাকে সন্দেহ করছ ?

বললেম: সন্দেহ করা উচিত কিনা, তাই ভাবছি।

ব্যস্ত ভাবে ভাস্কর বললেন: কেন এ কথা ভাবছ, বলবে কি ?

উত্তরে আমি শুধু হাসলেম।

ভাস্কর ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন: এ হাসবার কথা নয় মাধব। আমার কাজের উপর একটি কন্যার জীবন মরণ নির্ভর করছে। হেসে তুমি একে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রোনা।

বললেম : উড়িয়ে দেবার ইচ্ছা থাকলে একেবারেই নীরব ও নির্বিকার থাকতেম।

তবে ?

বললেম : আমি গত সন্ধ্যার কথা ভাবছি। মতঙ্গ পর্বতে লুকিয়ে থেকে যারা তোমায় চুরি করে নিয়ে গেল, তারা কোথায় খবর পেল ? কার কাছে ? ব্রাহ্মণের বেশে রক্তগোলাপ হাতে তুমি আসছ, সে কথা তাদের জানা ছিল। জানা না থাকলে, এত লোকের ভিতর তোমাকেই বা টেনে নিয়ে যাবে কেন ?

ভাস্কর চিন্তিত হলেন। বললেন : তুমি কি বলতে চাও—

আমি কিছুই বলতে চাইনে : কথার মাঝখানেই আমি তাকে থামিয়ে দিলেম : শুধু তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো বুদ্ধিটাকেও স্বচ্ছ রেখে চলতে বলি। বলের চেয়ে বুদ্ধি বড়, এ কথা সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। মোহে বা অহঙ্কারে নিজের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দিও না।

অন্যমনস্কভাবে ভাস্কর বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। বৃদ্ধার পরিচয়টা জেনে নেবার প্রয়োজনই ছিল সবচেয়ে বেশি।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : যা হবার তা হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার উপায় আর নেই।

প্রয়োজন হলে পিছিয়েও আসতে হবে। জেনে শুনে নিশ্চিত বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নারী উদ্ধারের নামে নিজের জীবন দেওয়াতে পৌরুষ নেই। তাকে উদ্ধার করেই পৌরুষ। এই সত্যটুকু তোমায় মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করছি'

ভাস্কর বললেন : চেষ্টা করব। কিন্তু প্রাণের মায়ায় আদর্শচ্যুত হবার পরামর্শ আমায় দিও না। সে যে মৃত্যুর চেয়েও নির্মম দণ্ড হবে।

আমি এ কথার উত্তর দিলেম না।

॥ বাইশ ॥

তুঙ্গভদ্রার তীরে যখন ফিরে এলেম, সূর্য তখন পাটে নামছেন। ক্লান্তিতে সারা শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। ভাস্কর বললেন: এই শোভা সৌন্দর্য ফেলে তোমার আশ্রমে গিয়েই একেবারে আশ্রয় নেবে?

বললেম: বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে বুঝি? এস, তাহলে পরপারে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া যাক!

ভাস্কর আপত্তি করলেন, বললেন: বিশ্রাম নিতে হয় তো উজিয়ে চল, সেই দিনকার সেই স্থানটিতে। আরাম ও আনন্দ দুইই পাওয়া যাবে।

টোকরায় করে নদী উত্তীর্ণ হয়ে আমরা তীরে তীরে হেঁটে এসে সেই স্থানটিতে উপবেশন করলেম। সত্যিই আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল।

এক সময় ভাস্কর প্রশ্ন করলেন: সেদিন তুমি বলেছিলে যে বিজয়নগর রাজ্যের পতনের সময় এসেছে। কাল মহারাজার মুখেও এই দুর্যোগের আশঙ্কার কথা শুনলেম। যুক্তি দিয়ে তুমি যা সন্দেহ করছ, অনুভূতি দিয়ে মহারাজা তার আশঙ্কা করছেন। এতে আমার বিস্ময় জাগছে।

বললেম: রাজায় রাজায় লড়াই এত সামান্য কারণে বাধে, যে বিশ্বাস করা যায় না। সেদিন তোমাকে বলছিলেম যে শত্রুসৃষ্টি তোমরাই কর। এ কথা যে কত সত্য, দু একটা গল্প বললেই তুমি মেনে নেবে।

ভাস্কর আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহর গল্প তাঁকে শোনালেম।

সিংহাসন লাভ করে ফিরোজ শাহ গুলবর্গায় উৎসবের আয়োজন করলেন। তাতে নৃত্য গীতের জন্য দিল্লী থেকে গায়ক ও নর্তকী আনলেন এক সহস্র। নাচে ও গানে এঁরা সুলতানকে মুগ্ধ করলেন। সুলতান বললেন, এদের উপযুক্ত বকশিস দাও। কিন্তু বকশিস কে দেবে? সুলতানের হুকুম হল, বিজয়নগরের রাজার কাছে পাঠাও পরওয়ানা। রাজা তো ক্ষেপেই আগুন। সুলতানের দূতকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর পরিক্রমা করালেন। তারপর এক হাজার অশ্বারোহী আর এক লক্ষ পদাতিক সেনা নিয়ে সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করলেন। অসংখ্য গ্রাম ধ্বংস করে আর নগর লুণ্ঠন করে সুলতানের মুদকল দুর্গ অধিকার করলেন। দুশো সেনা ছিল দুর্গরক্ষী, তাদের একজন মাত্র প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল। সংবাদ পেয়ে সুলতান এলেন প্রতিশোধ নিতে। দীর্ঘদিনের যুদ্ধে সুলতানের জয় হল। তারপর পৈশাচিক হত্যা লীলা। নরকেও বোধহয় এমন অমানুষিক অত্যাচার নেই।

বললেম: বাহমনী রাজ্য কেন ধ্বংস হল জানতো?

নিজে উত্তর না দিয়ে ভাস্কর আমার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বললেম: দক্ষিণী মুসলমান ও বিদেশী মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যই এই রাজ্যের পতনের সূত্রপাত করে। দুর্বল রাজ শক্তির সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসন কর্তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে সুরু করেন। এবং দেখতে না দেখতেই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয়ে গেল! মন্ত্রী কাশেম বারিদ বিদরে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তা বারিদশাহী বলে পরিচিত। সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা ইউসুফ আদিল খান। ইনি ছিলেন তুর্কীর সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এঁকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। এঁর বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। উপায়ান্তর না দেখে সুলতানা দাস ব্যবসায়ীদের শরণ নিলেন। তারা অনুরূপ একটি বালক ঘাতকের হাতে দিয়ে আদিল খানকে সমর্পণ করল শেখ সুফীর হাতে। যুবক আদিল ভারতে এল বাহমনী সুলতানের কর্মচারী হয়ে।

বিজাপুরের আদিল খানের উস্কানিতে নিজামশাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নিজাম উল-মুলক মালেক আহমদ। এঁর পিতার জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ কূলে। যুদ্ধে বন্দী হয়ে বাল্যকালেই তাঁর ধর্মান্তর ঘটে। শোনা যায়, মালেক আহমদ তাঁর রাজধানী আহমদ নগরের রাজপথে যখন বার হতেন, তখন কোনদিকে চাইতেন না। পরনারীর উপর দৃষ্টিপাত হলে ধর্মনষ্ট হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস! দ্বৈরথ যুদ্ধ তাঁর প্রিয় ছিল! একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তিনি দ্বৈরথ যুদ্ধের ব্যবস্থা করতেন। যে প্রথম আঘাত করত, তাকেই তিনি জয়ী বলতেন।

বেরারে ইমাদ শাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ইমাদ-উল-মুলক আলাউদ্দীন। এঁর পিতাও কানাড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। বন্দীদশায় তাঁর ধর্মান্তর হয়। নিজামের সঙ্গে শত্রুতা সাধন করতে গিয়ে অল্প দিনেই এঁর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়।

মালেক কুতব-উল-মুলক কুতব শাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন গোলকুণ্ডায়। ইনি পারস্যের লোক। একবার বাহমনী সুলতানের জীবনরক্ষা করে ইনি তাঁর প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন।

বললেম: পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু মনের মিল ছিল না কারও। আর এই মনোমালিন্যের পুরোপুরি সুযোগ নিতেন বিজয় নগরের মহারাজারা। নিজাম উদরস্থ করেছিলেন বেরার। বিদরের উপর লোভ বিজাপুরের। চাণক্যের মতো বুদ্ধি ধরেন আমাদের মন্ত্রী রামরাজা। প্রতিবেশী মুসলমান সুলতানদের ভিতর কলহ লাগিয়েই রেখেছেন।

ভাস্কর দেব বোধহয় ধৈর্য হারাচ্ছিলেন! তাঁর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেও বললেম: মহারাজ সদাশিব রায়ের রাজ্য প্রাপ্তির গল্প তুমি জান?

অনাসক্তভাবে ভাস্কর বললেন: না।

বললেম: ভাগ্যবান বলা উচিত আমাদের বর্তমান মহারাজাকে। ইনি রাজপুত্র নন। মহারাজা রাজা অচ্যুত রায়ের এক আত্মীয়। অচ্যুত রায়ের রাণী ছিলেন বরদা দেবী। আর পুত্র ভেঙ্কটাদ্রি, যিনি অকালে মারা যান। আমাদের মহারাজার পিতার নাম রঙ্গ রায় আর মাতা তিম্মাম্বা দেবী। ইনি রাজা হলেন নিতান্ত নাবালক বয়সে। রামরাজা তখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। রাজাকে নজরবন্দী রেখেই ইনি রাজ্য পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র করলেন রাজার মাতুল তিম্মরাজ ও অন্যান্য সচিবেরা। রামরাজাকে অবসর গ্রহণ করতে হল। তিম্মরাজ প্রধান মন্ত্রী হলেন। এবারে বিদ্রোহী হল নির্যাতিত সামন্ত রাজাগণ। তিম্মরাজ বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহর শরণাপন্ন হয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁকে আত্মহত্যা করে প্রজার নিগ্রহ মুক্ত হতে হল। রামরাজা আবার ক্ষমতা লাভ করলেন।

বললেম: রামরাজার পরিচয়ও আমাদের জানা আছে। এঁর পিতামহ রামরাজ, পিতা শ্রীরঙ্গ আর মাতা তিরুমলাম্বিকা দেবী। তিম্মরাজ ও ভেঙ্কটাদ্রি তাঁর দুই অনুজ ভ্রাতা।

ভাস্কর যে খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন, তা মনে হল না। তবু বললেম: তালিকোটের যুদ্ধের জন্য একমাত্র রামরাজাই দায়ী। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে সাহায্য করেছিলেন আহমদ নগর জয়ে। কিন্তু সেইখানেই তাঁর দাবার চালে ভুল হল। আহমদ নগরে তাঁর সেনাদলকে যথেচ্ছাচারের অনুমতি দিয়েছিলেন আর দুর্ব্যবহার করেছিলেন মুসলমান মিত্রদের সঙ্গে।

একদিন এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাঁরা সংঘবদ্ধ হলেন।

বিজাপুরের আদিল শাহ গেলেন গোলকুণ্ডার ইব্রাহিম কুতব শাহর কাছে। এঁরই মধ্যস্থতায় আহমদ নগরের হুসেন নিজাম শাহর সঙ্গে বিজাপুরের দীর্ঘ দিনের বিবাদ মিটে গেল। নিজাম নিজের কন্যা চাঁদ বিবিকে দিলেন আদিল শাহর হাতে, আর আদিলের কন্যাকে নিলেন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য। বিদরের বারিদ শাহও এই বিবাহ উৎসবে এসে যোগ দিলেন।

বললেম : আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উৎসবের আসরেই তাঁরা বিজয়নগর ধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

হঠাৎ লক্ষ্য করলেম, ভাস্করের মন নেই আমার কথায়। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছেন ধূসর দিগন্তের দিকে।

আকাশের প্রসাধন তখন মিলিয়ে গেছে। ভাস্কর তবু তাঁর চোখ ফেরাতে পাচ্ছেন না।

ডাকলেম : ভাস্কর!

ভাস্কর মুখ ফেরালেন।

বললেম : এমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ?

কথা কইলেন না ভাস্কর।

প্রশ্ন করলেম : কিছু ভাবছ?

এবারে আমার উত্তর দিলেন, বললেন : হ্যাঁ।

বলেই গুণতে লাগলেন : এক দুই তিন চার—

আশ্চর্য হয়ে বললেম : ও কী?

ভাস্কর তাঁর হিসেব শেষ করে বললেন : ষোল।

জিজ্ঞাসা করলেম : তুমি কি রাজকন্যার বয়স গণনা করলে?

ভাস্কর বললেন : বয়স নয়, অলিন্দ। এদিক থেকে যাবার সময় ষোড়শ অলিন্দটি হবে তাঁর।

বললেম : বয়সেও বোধহয় তিনি ষোড়শী হবেন।

ভাস্কর এ কথার জবাব দিলেন না।

॥ তেইশ ॥

পরদিন মধ্যাহ্নের আহার শীঘ্র সেরে ভাস্কর বেরিয়ে গেলেন। তার ত্বরা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলেম। আমার মনের কথাটি ধরতে পেরে ভাস্কর বললেন: আমার কাণ্ড দেখে হাসছ তো?

ব্যাপারটা যে হাসবার মতোই হচ্ছে ভাস্কর!

ভাস্কর হেসে উত্তর দিলেন: হাস তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার মৎলবের কথা আজ তোমার কাছেও ব্যক্ত করব না। লোকে বলে, বাতাসেরও কান আছে। বাতাসকেও আজ আমি বিশ্বাস করলেম না। বিজয়নগরের চর অন্তর্যামী কিনা, সেই কথা আজ জেনে নিচ্ছি।

আমি তার কথা শুনে শুধু হাসলেম।

ভাস্কর বললেন: প্রাণ নিয়ে আজ যদি ফিরে আসতে পারি মাধব, তবে তোমায় আমি বলে রাখছি, সেই দুস্থা নারীকে আমি উদ্ধার করবই। আনন্দের আতিশয্যে কাল যে ভুলটুকু করে ফেলেছি, শুধু তা সংশোধন করবার একটুখানি সময় চাই।

ভয় পেলে?

একটু কটুকণ্ঠে ভাস্কর বললেন: তা যদি পেয়ে থাকি তো সে ব্রাহ্মণের সঙ্গদোষে। নির্ভীকতায় ক্ষত্রিয়ের জন্মগত অধিকার।

ভাস্কর অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করলেম: জয়স্তু।

পিছন ফিরে ভাস্কর এবারে হাসলেন।

কিন্তু তিনি চলে যেতেই উদ্বেগে আমার মন ভরে গেল। সকাল বেলায় অধ্যয়নে যাবার প্রয়োজন হয় নি। রাজকন্যা আজ হাজরা রামস্বামীর মন্দিরে পূজার্চনায় যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন দূতমুখে। সম্মতি দিয়ে সকালটা আমি ভাস্করের সঙ্গেই কাটিয়েছি। অনেক যত্নে আমরা আমাদের শৈশবের দিনগুলিই ফিরে পেতে চেয়েছিলেম। কিন্তু যৌবনের দুঃস্বপ্ন বারে বারে আমাদের বাস্তবের ভিতর টেনে এনেছে। এতক্ষণে আতঙ্ক এল। বাস্তব যে কত নির্মম হয়, তার ছায়া দেখে শিহরে উঠলেম।

দ্বিপ্রহরটা বোধহয় একটা দুরন্ত অস্থিরতা নিয়ে কাটত। কিন্তু বেঁচে গেলেম। মতঙ্গ পর্বতের সেই তরুণ ব্রাহ্মণ এল ভীরু পদক্ষেপে। প্রণাম করে বলল: আপনাকে বিরক্ত করতে এলেম।

আম্রবৃক্ষের নিচে বাঁধানো বেদীর উপর আমি বসেছিলেম। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেম: এস ব্রাহ্মণ, এস বস।

আসন গ্রহণ করে সেই তরুণ আমার সম্বোধনের প্রতিবাদ করলেন, বললেন: আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন, আমার নাম সুদর্শন।

হেসে বললেম: তুমি সুদর্শনই বটে।

তরুণ লজ্জিত হলেন, বললেন: ও তো আমার প্রশংসা নয় আচার্যদেব। জন্মের প্রশংসা তো বিধাতার প্রাপ্য। বুদ্ধিমান মানুষ প্রতিষ্ঠা চাইবে তার আপন যোগ্যতার।

তা ঠিক। মনে হল, সমাজে যেদিন এই মনোভাবের জয় হবে, সেদিন নতুন পৃথিবী উঠবে গড়ে। একদল অপদার্থের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পৃথিবীর পুনর্জন্ম হবে। বললেম: সাধু!

সঙ্কোচের সঙ্গে সুদর্শন বলল: অনেক অধ্যবসায়ে ও অনেক পরিশ্রমে সামান্য মাত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

আমি কৌতূহলী হয়ে তার মুখের দিকে তাকালেম।

সুদর্শন বলল: মতঙ্গ পর্বতের সেই বাঁকটার নিকট কয়েকজন

নগর রক্ষককে দেখা গিয়েছিল। সূর্যাস্তের পূর্বে সাধারণ যাত্রীর বেশে তারা সেখানে অপেক্ষা করছিল।

নগর রক্ষক!

আমি চিন্তিত হলেম।

নগর রক্ষকই বটে : সুদর্শন সমর্থন করল : আমাদের যাত্রীদের কারও কারও পরিচিত তারা। তাদের অসহিষ্ণু পদচারণা কিছু সন্দেহেরও কারণ ঘটিয়েছিল।

সুদর্শন একটু থেমে বলল : এ সবই পূর্ব পরিকল্পিত বলে মনে হচ্ছে।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেম : শীতের মধ্যাহ্ন কি ঘরে বসে কাটাব? চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

সুদর্শন রাজী হয়ে বলল : চলুন।

আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলেম। সূর্য যতই পশ্চিমের দিকে হেলে পড়ছিলেন, আমার মন ততই চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ভাস্করকে আমি সাহায্য করবার অঙ্গীকার করেছি। এমন করে ঘরে বসে থাকলে আমার অধর্ম হবে। ভাবলেম, তুঙ্গভদ্রার পার ঘাটে বসে থাকলেও অনেক কিছু লক্ষ্য করা যাবে।

পথ চলতে চলতে সুদর্শন বলল : এই সব সংবাদ আহরণ করতে গিয়ে আমরা আর একটা সুসংবাদ জেনে এসেছি।

তার চোখে মুখে আনন্দের রশ্মি দেখে আমি কৌতূহলী হলেম।

সুদর্শন বলল : সেদিন এই কথাটি আপনি গোপন রেখেছিলেন।

বুঝতে পেরেও আমি নীরব রইলেম।

সুদর্শন বলল : মতঙ্গ পর্বতে যে বিদ্যা মন্দির নির্মিত হচ্ছে, তাতে আপনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন, এ কথা জেনে গুরুদেবও বড় আহ্লাদিত হয়েছেন। তিনিও একদিন আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আসবেন।

কথা না বলে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করলেম। তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে পৌঁছে সুদর্শন প্রশ্ন করল: পম্পা সরোবরে যাবেন?

বললেম: নিকটে কোথাও বসা যাক।

পারঘাট থেকে খানিকটা তফাতে একটু নির্জনে আমরা বসলেম। যাত্রীর পারাপারের দিকে আমার চোখ রইল সজাগ!

সুদর্শন আবার আমায় প্রশ্ন করল: নদী বুঝি আপনার ভাল লাগে?

বললেম: ঠিক বলেছ। শৃঙ্গেরী মঠে যখন ছিলেম, সন্ধ্যেবেলায় তখনও এই নদীতীরে এসে বসতেম। শুধু আমি কেন, মঠের আরও অনেক ছাত্র। বদ্ধ ঘরের ভিতরে মানুষের মনও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। প্রকৃতির উদার ঐশ্বর্যে তার প্রসার। এই জন্যই আমাদের তীর্থস্থান হয়েছে হিমালয়ে আর সমুদ্রতীরে। তীর্থস্থানই তো সাধনার স্থান। মানুষও সেখানে দেবতা হয়।

সুদর্শনের ভাল লাগল এসব কথা।

এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নামল। কিন্তু ফেরার তাড়া দেখলেম না তার। নিজের মনের আশঙ্কা এতক্ষণ গোপন রেখেছিলেম, অন্ধকারের সঙ্গে তা বাড়ল। সুদর্শন কখন তা টের পেয়েছিল খেয়াল করি নি, তার প্রশ্ন আমাকে সজ্ঞান করে দিল। বলল: আপনি কি ভাস্কর দেবের অপেক্ষা করছেন?

প্রথমটায় চমকে উঠেছিলেম। তারপর সামলে নিয়ে হেসে ফেললেম। বললেম: সত্যিই তাই। ওধার থেকে তিনি এই পথেই ফিরবেন, আশা করছি।

সুদর্শন বলল: তিনি বুঝি কিষ্কিন্ধ্যা পরিক্রমায় গেছেন? তাহলে এই পথেই ফেরা স্বাভাবিক।

তারপরেই বলল: কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই। নগরের অপর প্রান্তে যে পথ আছে, সে পথেও ফিরে যেতে পারেন।

পারাপারের যাত্রীদের উপর আমি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে

রেখেছিলেম। অন্ধকার যতই গভীর হচ্ছিল, চোখের পরিশ্রমও বাড়ছিল তত।

সুদর্শন বলল : আচার্যদেব কি আরও অপেক্ষা করবেন?

আমি তখন স্বপ্ন দেখছি। দেখেছি ভাস্করদেব বুঝি সেই বৃদ্ধার সঙ্গেই এদিকে আসছেন। দৃষ্টি আরও সংহত করে দেখলেম, সে পুরুষ ভাস্কর নন। রাজকুমারের দেহ অমন মেদ বহুল নয়, কিন্তু চলার ভিতর রাজপুরুষ-সুলভ আভিজাত্য আছে।

ওঁকে চেন সুদর্শন?

আমি প্রশ্ন করলেম।

চেনা চেনাই ঠেকছে যেন : সুদর্শন উত্তর দিল : কাছে গেলে হয়ত চিনতে পারব।

আর ঐ বৃদ্ধাকে?

বৃদ্ধাকে! না, ওকে কখনও দেখি নি।

সেই পুরুষকে টোকরায় তুলে দিয়ে বৃদ্ধা যখন ফিরে দাঁড়াল, খুশিতে সুদর্শন ঝলমল করে উঠল। বলল : চিনেছি ঐ রাজপুরুষকে, উনি আমাদের নগরপাল।

নগরপাল! সত্যিই তো। আমিও যে ত্বার তাঁকে দেখেছি। কেন চিনতে পারি নি বলতো?

অন্ধকারে মানুষ চেনা কঠিনই বটে।

হঠাৎ আমি অধীর হয়ে পড়লেম, বললেম : একটা কাজ করতে পার সুদর্শন? যেমন করে হোক, ঐ বৃদ্ধার পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে।

সুদর্শন আশ্চর্য হল, বলল : সে কি?

এই উদ্বেগের জন্য আমি তখন লজ্জিত হয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেম। সুদর্শন আমার লজ্জা লক্ষ্য করে বলল : বেশ কথা আচার্যদেব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তার পরিচয় সংগ্রহ করে আনছি।

কথা না বলে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করলেম। তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে পৌঁছে সুদর্শন প্রশ্ন করল: পম্পা সরোবরে যাবেন?

বললেম: নিকটে কোথাও বসা যাক।

পারঘাট থেকে খানিকটা তফাতে একটু নির্জনে আমরা বসলেম। যাত্রীর পারাপারের দিকে আমার চোখ রইল সজাগ!

সুদর্শন আবার আমায় প্রশ্ন করল: নদী বুঝি আপনার ভাল লাগে?

বললেম: ঠিক বলেছ। শৃঙ্গেরী মঠে যখন ছিলেম, সন্ধ্যেবেলায় তখনও এই নদীতীরে এসে বসতেম। শুধু আমি কেন, মঠের আরও অনেক ছাত্র। বন্ধ ঘরের ভিতরে মানুষের মনও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। প্রকৃতির উদার ঐশ্বর্যে তার প্রসার। এই জন্যই আমাদের তীর্থস্থান হয়েছে হিমালয়ে আর সমুদ্রতীরে। তীর্থস্থানই তো সাধনার স্থান। মানুষও সেখানে দেবতা হয়।

সুদর্শনের ভাল লাগল এসব কথা।

এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নামল। কিন্তু ফেরার তাড়া দেখলেম না তার। নিজের মনের আশঙ্কা এতক্ষণ গোপন রেখেছিলেম, অন্ধকারের সঙ্গে তা বাড়ল। সুদর্শন কখন তা টের পেয়েছিল খেয়াল করি নি, তার প্রশ্ন আমাকে সজ্ঞান করে দিল। বলল: আপনি কি ভাস্কর দেবের অপেক্ষা করছেন?

প্রথমটায় চমকে উঠেছিলেম। তারপর সামলে নিয়ে হেসে ফেললেম। বললেম: সত্যিই তাই। ওধার থেকে তিনি এই পথেই ফিরবেন, আশা করছি।

সুদর্শন বলল: তিনি বুঝি কিষ্কিন্ধ্যা পরিক্রমায় গেছেন? তাহলে এই পথেই ফেরা স্বাভাবিক।

তারপরেই বলল: কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই। নগরের অপর প্রান্তে যে পথ আছে, সে পথেও ফিরে যেতে পারেন।

পারাপারের যাত্রীদের উপর আমি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে

রেখেছিলেম। অন্ধকার যতই গভীর হচ্ছিল, চোখের পরিশ্রমও বাড়ছিল তত।

সুদর্শন বলল : আচার্যদেব কি আরও অপেক্ষা করবেন?

আমি তখন স্বপ্ন দেখছি। দেখেছি ভাস্করদেব বুঝি সেই বৃদ্ধার সঙ্গেই এদিকে আসছেন। দৃষ্টি আরও সংহত করে দেখলেম, সে পুরুষ ভাস্কর নন। রাজকুমারের দেহ অমন মেদ বহুল নয়, কিন্তু চলার ভিতর রাজপুরুষ-সুলভ আভিজাত্য আছে।

ওঁকে চেন সুদর্শন?

আমি প্রশ্ন করলেম।

চেনা চেনাই ঠেকছে যেন : সুদর্শন উত্তর দিল : কাছে গেলে হয়ত চিনতে পারব।

আর ঐ বৃদ্ধাকে?

বৃদ্ধাকে! না, ওকে কখনও দেখি নি।

সেই পুরুষকে টোকরায় তুলে দিয়ে বৃদ্ধা যখন ফিরে দাঁড়াল, খুশিতে সুদর্শন ঝলমল করে উঠল। বলল : চিনেছি ঐ রাজপুরুষকে, উনি আমাদের নগরপাল।

নগরপাল! সত্যিই তো। আমিও যে দুবার তাঁকে দেখেছি। কেন চিনতে পারি নি বলতো?

অন্ধকারে মানুষ চেনা কঠিনই বটে।

হঠাৎ আমি অধীর হয়ে পড়লেম, বললেম : একটা কাজ করতে পার সুদর্শন? যেমন করে হোক, ঐ বৃদ্ধার পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে।

সুদর্শন আশ্চর্য হল, বলল : সে কি?

এই উদ্বেগের জন্য আমি তখন লজ্জিত হয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেম। সুদর্শন আমার লজ্জা লক্ষ্য করে বলল : বেশ কথা আচার্যদেব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তার পরিচয় সংগ্রহ করে আনছি।

সে কি সম্ভব ?

অসম্ভব হলেও তা সংগ্রহ করতে হবে।

স্মিত হাস্যে এই উত্তর দিয়ে সুদর্শন এগিয়ে গেল।

অন্ধকারে বেশিক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হল না। কয়েক দণ্ড পরেই সে ফিরে এল। বলল : আপনার আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেম। নামমাত্র আয়াসেই কৃতকার্য হয়ে এলেম ।

প্রসন্ন চিত্তে আমি তাকে গ্রহণ করলেম।

সুদর্শন বলল : ঐ বৃদ্ধা এক সময় মহারাণীর পরিচারিকা ছিল। এখন তার অবসরের জীবন। নিকটেই বাসগৃহ।

বললেম : তার অন্য কিছু পরিচয় নেই ?

বুঝতে না পেরে সুদর্শন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললেম : নগরপালের সঙ্গে শুধু পরিচয়ই নয়, হৃদ্যতাও আছে দেখা গেল। তাই এই প্রশ্ন করছি।

সত্যি কথা। কিন্তু এ সংবাদটুকু সংগ্রহ করতে পারি নি। ঠিক পারি নি নয়, এ প্রশ্ন আমার বুদ্ধিতেই আসে নি।

তার প্রয়োজন নেই।

উত্তর আমি পেয়ে গিয়েছি। তাই ব্যাকুল হলেম হতভাগ্য ভাস্করের কথা স্মরণ করে। সে যে সফল হয় নি, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না।

ফেরার পথে সুদর্শনকে আমি সেই কথা বললেম। সুদর্শনও চিন্তিত হল, বলল : চলুন, আপনার আশ্রমটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

অন্ধকার পথ। কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় মিশে নেশা ঘনাচ্ছে। শীতল হাওয়া বইছে অল্প অল্প। তারই সঙ্গে আমাদের পাদুকার শব্দ একটানা অবিশ্রাম।

আচার্যদেব !

বল।

একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব?

আমি হেসে ফেললেম।

সুদর্শন লজ্জিত হল, বলল: সেদিন ভাস্কর দেবের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হল, জানবার বড় কৌতূহল হচ্ছে। কাল সকাল বেলায় আপনার আশ্রমে এসে আমি ফিরে গেছি।

আমি সংক্ষেপে বললেম: পরদিন সকালে, আমার আশ্রমে। মত্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

সুদর্শন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না।

আরও খানিকক্ষণ পথ অতিক্রম করে বললেম: চল, আমরা প্রধান রাজপথ ধরে ফিরি।

আমি জানতেম, ভাস্করের দেখা এখন মিলবে না। তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে কোন লাভই হবে না। তবু তাঁকে খুঁজে খুঁজে চললেম। পথের দুধারে তাঁকে খুঁজলেম।

কোথাও তাঁর সাক্ষাৎ মিলল না। আশ্রমেও না। সুদর্শন আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল: কাল সকালে তিনি ফিরে আসবেন।

মনে হল, ভাস্কর সম্বন্ধে সুদর্শন একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছে।

বললেম: বোধহয় তাই।

প্রণাম করে সুদর্শন বিদায় নিল।

॥ চব্বিশ ॥

প্রভাতের পূর্বে ভাস্করকে পাওয়া যাবে না আমি জানতেম। কিন্তু সুদর্শনের ইঙ্গিতে আমি বিশ্বাস করি নি। সে আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু কয়েক দিনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সে অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ভাস্করের শৈশব আমি দেখেছি, দেখি নি তার দুরন্ত যৌবন। তার বংশের গৌরব জানি, জানি না তার ব্যক্তিগত বীর্যের কাহিনী। তবু আমার মনে হল, সুদর্শনের সন্দেহ মিথ্যা! স্বেচ্ছায় সে বাহিরে রাত্রি যাপন করবে না। তার অভিযানে সে যে ব্যর্থ হয়েছে, তা সুনিশ্চিত। সফল হলে আমার পূর্বেই সে গৃহে ফিরত। কালকের মতো কোন প্রমোদালয়ে হয়তো বন্দী হয়ে আছে। রাত্রি গভীর হলে ধরাধরি করে তাকে বাইরে ফেলে দেবে।

আজ একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলেম। কাল রাতের মতো উদ্বেগে মন অধীর হল না। নিত্যকর্মের মতো মানুষ দুশ্চিন্তাতেও বুঝি অভ্যস্ত হয়ে যায়। গভীর শোকেও মানুষ বিচলিত হয় না শুনেছি। সমুদ্রের ঢেউএর মতো শোক যখন একটার পর একটা আসে, তখন বিদ্যুতে ছোঁয়া শরীর নিয়ে অসাড় মানুষ পারের উপর পড়ে থাকে। বেলার বালির মতোই অসাড় শরীর, তরঙ্গের আঘাতে কোন সাড় জাগে না তাতে। এক সময়ে বুঝি ঘুমিয়েই পড়লেম।

মনে হয়েছিল, এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে নিদ্রাভঙ্গ হল। ঘরের ভিতর অন্ধকার

তখন নীরন্ধ্র। কোনদিক থেকে এতটুকু আলোর সন্ধান পাচ্ছিনে। সন্ধান যার পেলেম, সে দুর্ভাবনার। ভাস্করের কথা মনে পড়ল।

মনে পড়ল গত সন্ধ্যার কথা। বৃদ্ধার সঙ্গে নগরপালের কথা। আর মতঙ্গ পর্বতের সেই নগররক্ষীদের কথা। ভাস্কর আজ কোথায় বন্দী হয়ে আছে জানিনে। কিন্তু কোথাও যে আটকা পড়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তারপরেই মনে পড়ল তুঙ্গভদ্রার স্নানার্থী ব্রাহ্মণদের বাক্যালাপ। প্রধান রাজপথে ভাস্করকে তারা অচৈতন্য দেখে এসেছিল। আজও যে সেই হতভাগ্য সেইখানেই পড়ে নেই, কে জানে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠলেম শয্যা থেকে।

অন্ধকারে হাতড়ে পশমী উত্তরীয় খানা সংগ্রহ করে নিলেম। সেখানা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেম ঘর থেকে।

পাণ্ডুর আকাশের নিচে অন্ধকার রাত্রি কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্তব্ধ শীতার্ত রাত্রি সমস্ত স্নায়ু একত্র করে প্রসন্ন প্রভাতের প্রতীক্ষা করছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলেম। দৃষ্টির প্রসারতা আর নেই, অবারিত বিশ্ব আজ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। বাতাসে নিজের কান পেতে দিলেম। শ্রবণ বুঝি বধির হয়ে গেছে, বুকের স্পন্দনে আর শব্দ নেই। আমি কি পাথর হয়ে গেলেম!

কিন্তু পাথর হলে তো চলবে না! প্রধান রাজপথের পাশে আর একটি পাথর হয়তো পড়ে আছে। তাকে কুড়িয়ে আনতে হবে। টুপটাপ করে কয়েকটা আমের মঞ্জরী ঝড়ে পড়ল। তার সৌরভ পেলেম বাতাসে। এইতো জীবন! এইতো আমি বেঁচে আছি। আমি তো পাথর হয়ে যাই নি! বুক ভরে খানিকটা নিঃশ্বাস নিলেম, আশ্বাসে আনন্দে নেমে এলেম পথের উপর।

সেই পথ! গাছে গাছে ছেয়ে ফেলা অন্ধকার পথ! কিন্তু চলতে এতটুকু কষ্ট হল না।

বিজয় নগর এখন ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। সমস্ত বিশ্বটাই

ঘুমচ্ছে। পাহারারত নগররক্ষীও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি শুধু জেগে আছি। এগিয়ে যাচ্ছি। নিজের পাদুকার শব্দ শুনেই সাহস পাচ্ছি এগিয়ে চলবার।

হিমেল হাওয়া এল উত্তর থেকে। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠল। মনে হল, এই হাওয়াতেই মূর্চ্ছা গেছে প্রধান রাজপথ। দূরে দূরে প্রদীপের আলোয় তার জীবনের সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে অল্প অল্প।

সেই আলোতেই আমি ভাস্করকে খুঁজে পেলেম। একতাল মাংস পিণ্ড, তার ভিতর একটুখানি জীবন এখনও ধুক ধুক করছে। শুধু ঘুমে নয়, নেশায় অচেতন। ব্রাহ্মণেরা ঠিকই বলেছিলেন। নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগানো যাবে না।

কিন্তু তাঁকে ফেলে যাওয়াও তো চলবে না! দুহাতে তাঁকে তুলে নিয়ে যাব, সে সামর্থ্য আমার কোথায়! তবু চেষ্টা করলেম, মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকলেম ঃ ভাস্কর!

কোন সাড়া নেই।

নিজের ডান হাতটা তাঁর গলার তলা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে তাঁকে খানিকটা উঁচু করবার চেষ্টা করলেম। তুষারের মতো শীতল হয়ে গেছে তাঁর শরীর। কতক্ষণ এখানে পড়ে আছেন, তা অন্তর্যামীই জানেন। সে যে অল্পক্ষণ নয়, আমি শুধু এই কথাই জানলেম।

ভাস্করের মাথায় চেতনা ছিল না, কিন্তু দেহে প্রাণ ছিল। আমার হাতের উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বললেন। আনন্দে আমার রোমাঞ্চ হল। বললেম ঃ ভাস্কর, আমি মাধব!

মাধব!

অন্ধকারে দুটো হাত বাড়িয়ে ভাস্কর আমায় খুঁজতে লাগলেন। তাঁর অপ্রকৃতিস্থ দুখানা হাতের ভিতর আমার গলা বাড়িয়ে দিলেম। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভাস্কর আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি

তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেম। তখনও তাঁর পা টলছিল, এই দুরন্ত শীতেও তাঁর নেশার ঘোর কেটে যায় নি।

ভাস্করের হাতের দিকে হঠাৎ নজর পড়ল। ডান হাতের শক্ত মুঠিতে কী একটা ধরে আছেন। মনে হল, একখণ্ড ভূর্জপত্র। অচৈতন্য অবস্থায় কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে।

তাঁর হাত থেকে সেখানা সংগ্রহ করে নিজের কোমরে গুঁজে রাখব কিনা ভাবছিলেম। হঠাৎ সব এলোমেলো হয়ে গেল। অদূরের এক গৃহকোণে প্রাণ স্পন্দনের সঙ্কেত পেলেম! বাতায়নের সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে একফালি আলো এসে রাজপথে পড়েছিল। সেই আলোর আড়ালে এক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি দেখলেম। শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র। বিদ্যুতের মতো তীক্ষ্ণ নয়, ঘৃতের প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ আবেশময়। এক ঝলক বাতাসে সে দৃষ্টি নিবে গেল। দেখলেম, সে বাতায়ন বন্ধ হয়ে গেছে।

এ তো কোন সাধারণ রঙ্গালয় নয়। তবে এ কার গৃহ! ভাল করে চারিদিকে চেয়েও কোন হদিস পেলেম না। হদিস যার পেলেম, সে আতঙ্কের। ভাস্কর কী করে এখানে এলেন, সেই ভাবনা এল মনে। গত কালও বোধ হয় তিনি এই খানেই একই অবস্থায় পড়েছিলেন। রাত্রের প্রথম প্রহরে প্রধান রাজপথের উপর তাঁকে বন্দী করে আনা হল, অথচ কেউই সে কথা জানল না, কেউই সে দৃশ্য দেখল না! তবে কি—

সারা গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে কি বিজয়নগরের মাটির নিচে গুপ্ত পথ আছে! আছে তুঙ্গভদ্রার নিচে দিয়েও! কিন্তু সে কী করে সম্ভব। আমি ঘেমে উঠলেম। পর্বতের মতো ভারি মনে হল ভাস্করের অচেতন দেহ।

অচেতন নয়। অল্প অল্প করে তাঁর চেতনা ফিরে আসছে। স্খলিত পায়ে তখন তিনি পথ চলতে শুরু করেছেন।

রাস্তার দুধারে আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেম। আমার মনে

হচ্ছিল, অন্ধকারের ভিতর থেকে আরও কয়েক জোড়া চোখ আমাদের লক্ষ্য করছে। সেই সব চোখে স্নেহ নেই, মমতা নেই। হিংস্র পশুর মতো ক্রূর তাদের দৃষ্টি। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার লালসা নিয়ে ওঁৎ পেতে লুকিয়ে আছে। চলার গতি আমি বাড়িয়ে দিলেম।

প্রধান রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার গলিপথে নেমে আরাম পেলেম অন্ধকারে ভয় আছে পাহাড়ের মতো, সমুদ্রের মতো। তারা হিংস্র নয়, তারা নিষ্ঠুর নয়। তবু মানুষ ভয় পায়! এত উদার এত বিরাট তারা যে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে সবল ভাবতে পারে না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এই অন্ধকারের ভিতর আমি নিশ্চিন্ত ভাবলেম নিজেকে।

মনে হল, নিষ্ঠুর যদি কিছু থাকে তো সে আমাদের সভ্যতা। বনে মানুষ মানুষ ছিল, পশুর সঙ্গে প্রভেদ ছিল তার। শহরে মানুষ পশু হচ্ছে, তাদের প্রভেদ কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। বনে মানুষের বন্যতা ছিল বাহিরের, মনের সম্পদে সে ছিল দেবতা। আর আজ?

॥ পাঁচিশ ॥

ভাস্করকে শুইয়ে দিয়ে আমি তুঙ্গভদ্রার তীরে গিয়েছিলেম সন্ধ্যা বন্দনার জন্য। ফিরে এসে দেখলেম, সুস্থ হয়ে তিনিও উঠে বসেছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন: এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব।

বললেম: অপমান কিসের?

কিসের অপমান! বারে বারে আমি হেরে যাচ্ছি, সে আমার অপমান নয়?

বললেম: কাল যখন বেরিয়েছিলে, তখন তো একথা জানাই ছিল ভাস্কর। প্রথমবার হেরেছ অবজ্ঞার জন্য, অর্বাচীনতার জন্য দ্বিতীয়বার।

কথার মাঝখানেই ভাস্কর বলে উঠলেন: তৃতীয়বার আমার জয় হবে, কী বল?

বললেম: তোমার প্রাণের ভয় নেই?

ভাস্কর হাসলেন, বললেন: আমার হাতের পত্রখানি তাহলে দেখেছ দেখতে পাচ্ছি।

অসঙ্কোচে সে কথা স্বীকার করলেম! তাকে ঘরে এনে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে আমি প্রদীপ জেলেছিলেম। সেই আলোতে পড়েছিলেম তার ভূর্জপত্রের লিপিখানি। এক দিকে কোমল হাতের নিমন্ত্রণ লেখা ছিল মাল্যবান গিরির প্রাচীন দেবালয় প্রাঙ্গণে সূর্যাস্তের দণ্ডে, অন্য দিকে অন্য হাতে মৃত্যুভয় মুদ্রিত ছিল পরুষ ভাষায়।

ভাস্কর বললেন: পরের পত্র পড়তে আজ তোমার শাস্ত্রে বাধছে না ?

বললেম: এখানে সেই বাধাকে অতিক্রম করে গেল কর্তব্য বোধ।

ভাস্কর হঠাৎ যেন উদ্বিগ্ন হলেন, বললেন: একটা কথা আমায় বলতে পার ?

আমি তাঁর মুখের দিকে শুধু তাকালেম।

ভাস্কর বললেন: যারা আমায় বন্দী করে নিয়ে এল, আমার বিপক্ষ দল তারা।

এই নিমন্ত্রণ পত্র তাহলে কে আমার হাতে দিল ?

বললেম: এই হস্তাক্ষর বোধহয় লক্ষ্য করেছ। সেদিন মতঙ্গ পর্বতের 'ম' এর সঙ্গে আজকের মাল্যবান গিরির 'ম' এর কোন মিল নেই। মনে হচ্ছে, এ দুজনের লেখা। কিন্তু সাবধানীটি একই হাতের।

ভাস্কর যেন বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

বললেম: এ সবও লক্ষ্য করবার জিনিস। দেহে শক্তি থাকলেই সব কিছু উপেক্ষা করা যায় না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে ভাস্কর বললেন: তুমি কি মনে কর এ সমস্তই ছলনা ?

বললেম: সে কথা মনে করলে তোমাকে অনেক আগেই বিরত করবার চেষ্টা করতেম।

তবে ?

তার আগে তোমার সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার কথা বল !

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাস্কর বললেন: ভেবেছিলেম, আমাদের শত্রুপক্ষ কোন সতর্কতা অবলম্বন করার পূর্বেই আমি তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করব এবং গুপ্ত পথে যাব সেই বৃদ্ধার কাছে। গিয়েছিলেম, কিন্তু—

তারই গৃহে বন্দী হলে, এই তো !

ভাস্কর চমকে উঠলেন, বললেন : তুমি জান একথা ?

না জানলেও অনুমান করতে পারি।

সেকি !

ভাস্করের বিস্ময় তখন কাটে নি। তাই বৃদ্ধার পরিচয় তাকে দিলেম। বললেম : নগরপাল যে তাকে রাজ-অন্তঃপুরের চর রূপে ব্যবহার করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার স্বরূপ যে এখনও ধরা পড়ে নি, এইটেই আশ্চর্য !

একটু থেমে বললেম : তার কাছে আরও একটু সাহায্যের প্রয়োজন আছে।

তুমি কি পাগল হলে ?

পাগল হলে তার সাহায্য চাইতেম না। আমরা যে তাকে চিনতে পারি নি, সেইটুকু ঘোষণা করার দরকার আছে।

ভাস্কর খুশী হলেন, বললেম : সাবাস !

বললেম : তোমার প্রশংসা পরে নেব। আগে তোমার অভিজ্ঞতার গল্প শেষ কর।

অভিজ্ঞতার গল্প ব'লোনা, বল অজ্ঞানতার গল্প। তারা আমার চোখ মুখ বেঁধে কী ভাবে কোথা দিয়ে সেই প্রমোদালয়ে নিয়ে আসে, কালও তা বুঝতে পারলেম না। তবে যাঁর কাছে নিয়ে আসে, কাল তাঁকে যেন খানিকটা চিনতে পেরেছি। কালিদাসের কালের মালবিকা তিনি। রূপে গুণে জ্ঞানে ও সঙ্গীতকলায় তিনি মনোহারিণী। প্রথম দিন তাঁর যে পরিচয় পেয়ে আমি তাঁকে ঘৃণা করেছিলেম, কাল জানলেম সে তাঁর মিথ্যা রূপ। রাজপুরুষের মনোরঞ্জনে তাকে মিথ্যার অভিনয় করতে হচ্ছে। তুমি আমায় ভুল বুঝো না মাধব, পাশের ঘরে বন্দী থেকে আমি তাঁর মনের পরিচয় খানিকটা জেনে এসেছি। সেই রাজপুরুষ কাল কিছু দেরিতে এসেছিলেন। অন্ধকার ঘরে আমাকে তাঁর অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। মুক্তির জন্য আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তখন সজাগ রেখেছিলাম।

ভাস্কর থামলেন না, বললেন : আমি উৎকর্ণ হয়ে সেই নারীর সঙ্গে রাজপুরুষের কথোপকথন শুনলেম। বুঝতে পারলেম যে তাঁদের মতভেদ আছে। এবং সেই নারীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত কাজ করতে হচ্ছে। তার মুখের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কাজের নেই। জোর এখন শক্তির, পরস্পরের মনের উপর অধিকার তাঁরা হারিয়েছেন।

আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভাস্করের এই গল্প মিলিয়ে নিলেম। সবটাই বুঝি মিলে গেল। পত্রের অর্থও স্পষ্ট হল খানিকটা। উচ্ছ্বসিত ভাবে আমি বললেম : আমার একটা কথা রাখবে ভাস্কর?

শ্রান্ত ভাবে ভাস্কর বললেন : বল।

যদি কথা দাও, তবেই বলি।

পিছিয়ে আসবার অনুরোধ না করলে নিশ্চয়ই রাখব।

সে অনুরোধ আমার নয়, আমি এগিয়ে যেতেই বলব।

খুশীতে ঝলমল করে উঠল ভাস্করের চোখ। তিনি ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন : রাখব। কিন্তু এবারে হেরে গেলে সংশোধনের সময় আর পাবনা।

তাই কি তুমি মনে কর?

ভাস্কর বললেন : প্রাণের ভয় আমি করিনে। কেননা, দুবার যখন তারা ছেড়ে দিয়েছে, তখন তৃতীয় বারও দিতে পারে। আমি ভয় পাচ্ছি যুদ্ধের ফলাফলের। তালিকোটের যুদ্ধ বোধ হয় শেষ হয়ে এল।

বল কি!

আমি উদ্বিগ্ন হলেম।

ভাস্কর বললেন : কদিন থেকে এই খবর পাচ্ছিলেম। অসমর্থিত খবর। আজ বিশ্বাস করবার মতো উপাদান পেয়েছি। দক্ষিণে ও বামে তিম্মরাজ ও ভেঙ্কটাদ্রি খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছেন বটে, কিন্তু সুলতান হুসেন নিজাম মধ্যভাগে রামরাজার মুখোমুখি যুদ্ধ করছেন। তাঁর ব্যূহ ভেদ করা দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে।

খুশী হয়ে বললেম : তাহলে আমাদের জয়েরই সূচনা হয়েছে বল।

ভাস্কর আমার মুখের দিকে চাইলেন স্থির দৃষ্টিতে। মনে হল, আমার অজ্ঞতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে বললেন: আমাদের সেনার মনোবৃত্তি তুমি ভুলে যাচ্ছ, তাই এমন কথা ভাবতে পারলে। যারা শুধু পয়সার লোভে যুদ্ধ করে, বা যুদ্ধ করে দণ্ডের ভয়ে, তাদের দাম নেই। আছে মৃত্যু ভয়। প্রথম আঘাতে যদি জয় লাভ করতে না পারে, তো প্রথম প্রতিঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে আসবে। যুদ্ধের এই নিয়ম।

আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল। বললেম: আমাদের সেনার এই ভাড়াটে মনোভাবের কথা তুমি কোথায় জানলে?

ভাস্কর হাসলেন, বললেন: সেদিন বাজার থেকে তো এই সংবাদই সংগ্রহ করে এনেছিলেম। রামরাজার সঙ্গে যে সেনাদল তারা তাকিয়ে আছে তাঁর সিন্দুকের দিকে। তিম্মরাজ ও ভেঙ্কটাদ্রির সেনা লড়ছে দণ্ডের ভয়ে, দেশরক্ষা বা ধর্মরক্ষার অনুপ্রেরণা নেই কারও প্রাণে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন: তাই আমার ভয় হচ্ছে। তিম্মরাজ বা ভেঙ্কটাদ্রি যদি আজ ব্যূহ ভেদ করতে না পারেন, তাহলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য। হুসেন নিজামের নজর রামরাজার উপর।

এত কথা ভাস্কর কোথা থেকে জানলেন, সেই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলেম। আমার কৌতূহল তিনি নিবৃত্তি করলেন। বললেন: কাল দূত এইসব সংবাদ দিচ্ছিলেন সেই রাজপুরুষকে। আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি মাধব, যুদ্ধের জয় পরাজয় আজই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

আমার মুখে কথা যোগাল না।

ভাস্কর থামলেন না, বললেন: নিজের ভাগ্য সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। নিজের জন্য আর আমার ভাবনা নেই।

ভাবনা কার জন্য তা বুঝি। বললেম: তোমার জন্য আমি ভাবব।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে ভাস্কর আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেম: সত্যিই ভাবব।

ভাস্কর বললেন : যা করবার আজই করে ফেল মাধব, কাল বোধহয় আর কিছুর সময় পাওয়া যাবে না।

এত তাড়াতাড়ি ?

শুভস্য শীঘ্রম ! আমি রহস্য করছি না মাধব, তুমি আজই একটা ব্যবস্থা কর।

আজই !

আমি চিন্তা করতে লাগলেম, আজই ব্যবস্থা করতে হবে। হঠাৎ একটা ফন্দি এল মাথায়। বললেম : বেশ, তাই হবে।

ঘর থেকে একখণ্ড ভূর্জপত্র আর মসি লেখনী নিয়ে এলেম। খসখস করে পত্র লিখে ফেললেম একখানা। তারপর ভাস্করকে সেই পত্র দিয়ে বললেম বৃদ্ধার কাছে পৌঁছে দিতে।

পলকমাত্রে ভাস্কর সে লেখাটুকু পড়ে দেখলেন—মাল্যবান গিরির মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা হবে সূর্যাস্তের দণ্ডে। তারপর তাঁর বিস্ময় তুলে ধরলেন আমার মুখের উপর।

বললেম : ভাবছ, এই লেখা পৌঁছবেনা সেই কন্যার হাতে। তাতে ক্ষতি কী ? আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে অন্য উপায়ে।

ভাস্কর প্রতিবাদ করলেন। বললেন : শত্রুপক্ষকে আমরা কি তাতে বেশি তৎপর হবার নির্দেশ দেব না ?

ঠিক তাই। বারে বারে তারা আমাদের সাবধান হতে বলছে, আমাদেরও কি কর্তব্য নয় তাদের সতর্ক হবার সুযোগ দেবার !

আমার সাহস দেখে ভাস্কর যে খুশী হলেন না, তা বুঝতে পারলেম। হেসে বললেম : আমি এখন রাজকন্যার অধ্যাপনায় যাচ্ছি। এই অবসরে তুমিও তোমার কাজটুকু সেরে এস, আমার অবাধ্য হয়ো না। তোমাকে সফল করবার দায়ীত্ব আজ আমি নিলেম।

মুখে খানিকটা প্রসন্নতা আনবার চেষ্টা করলেন ভাস্কর। বললেন : বুঝতে পারছি, আমার চাণক্যের প্রয়োজন হয়েছিল গোড়াতেই।

কাঁধের উত্তরীয় সামলে আমি বেরিয়ে পড়লেম।

॥ ছাব্বিশ ॥

বেলা পড়বার আগেই আমি আমার সজ্জার আয়োজন করলেম। বললেম : রাজকুমার, অনেক দিন তোমায় আমি ব্রাহ্মণের বেশে সাজিয়েছি। আজ তুমি আমায় রাজকুমার সাজাও।

এ তুমি কী বলছ ব্রাহ্মণ ?

ভাস্করের দুচোখে বিস্ময় বেরল ঠিকরে।

হেসে বললেম : আমার অনেক দিনের শখ।

ভাস্কর কী বুঝলেন জানিনে, আমাকে সাজাতে শুরু করলেন। এক সময় শেষ করে বললেন : সত্যই ভ্রম হচ্ছে।

কিসের ভ্রম ?

রাজকুমার হেসে উত্তর দিলেন : ভাস্করদেব বলে পরিচয় দিলে কেউ তোমায় সন্দেহ করবেনা।

এবার আমিও হাসলেম। বললেম : দাঁড়াও, বাহিরটা আর একবার দেখে এসে তোমার কথার জবাব দিচ্ছি।

ঘরে সজ্জা শুরু করবার পূর্বেও ভাল করে একবার আমার অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ দেখেছি। এবারে আর একবার দেখে নিলেম। ফিরে এসে ভাস্করকে তার জবাব দিলেম : আজ সূর্যাস্তের দণ্ডে সেই পরিচয়ই তো দিতে চাই।

বজ্রাহতের মতো ভাস্কর চমকে উঠলেন। বললেন : এ তুমি কী বলছ মাধব ?

শান্ত স্বরে বললেম : ঠিকই বলছি। সূর্যাস্তের একদণ্ড পরে

তুমি তুঙ্গভদ্রার স্নানঘাটে যাবে ব্রাহ্মণের বেশে। সেইখানে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে।

ভাস্কর বুঝি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না। আমি তাকে আশ্বাস দিলেম: সরস্বতীর সঙ্গে এই ব্যবস্থাই করে এসেছি।

কিন্তু—

ভাস্করের কণ্ঠরোধ হল।

বললেম: এর মধ্যে কিন্তু কী আছে?

তোমার প্রাণ যে বিপন্ন হবে!

তার কথায় বুঝি আর্তনাদের শব্দ পেলেম।

বললেম: বিপন্ন হবে, কিন্তু যাবে না। তার পরিবর্তে কী লাভ হবে জান? একটি অমূল্য প্রাণ।

ভাস্কর আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর দুহাত জড়িয়ে ধরলেম, বললেম: তুমি বাধা দিও না রাজকুমার। ভারতের নিগৃহীত হিন্দু আজ তোমাদের মুখ চেয়ে আছে। তাদের সুখ দুঃখ জড়িয়ে আছে তোমাদের জীবনের সঙ্গে। তোমরা জয়ী হলেই তারা আবার বেঁচে উঠবার স্বপ্ন দেখবে।

ভাস্করের চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল। বললেন: তুমি আজ আমায় আশীর্বাদ কর ব্রাহ্মণ। তোমার এই ত্যাগের পুণ্য যেন আমায় সার্থক করে।

জয়স্তু।

বলে আমি বেরিয়ে পড়লেম।

বন্দী হবার জন্যেই আমি চলেছি। কাজেই আমার ভয় ছিল না। পিছন ফিরে একবার সূর্যাস্তের দিকে দেখলেম, আর একবার দেখলেম পথের দুধার। হঠাৎ মনে হল, এমন সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। রাজপথ ছেড়ে দিয়ে আমি গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চললেম।

বেশি দূর নয়। মাল্যবান গিরি পৌঁছবার আগেই আমি বন্দী হয়ে গেলেম। আশপাশ থেকে জন কয়েক লোক লাফিয়ে এসে আমার চোখ মুখ বেঁধে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমার ভয় ছিল অন্যরকম। পাছে কেউ আমায় চেনবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ তা করল না। ভাল লাগল। শান্তি পেলেম। মনে হল, গভীর স্নেহে কে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে।

তবে কি—

মনে হল, শক্ত মাটির উপর আমি শুয়ে আছি। চোখ মুখের কাপড় বড় শক্ত করে বাঁধা। কথা বলবার ক্ষমতা নেই, নেই কিছু দেখবার উপায়। তবু মনে হল, অন্ধকার আরও গভীর হয়েছে। গুমোট অন্ধকার। মাথার উপরে বুঝি উদার আকাশ আর নেই।

কতক্ষণ পড়ে ছিলেম জানিনে। হঠাৎ কার পদধ্বনিতে চমক ভাঙ্গল। নূপুরের নিক্কন, না কোন কণ্ঠস্বর। ভাস্কর কি এঁরই কথা আমায় বলেছেন।

কাল রাত্রির কথা আমার মনে পড়ল। সেই বাতায়ন পথে কি আমি এঁরই দৃষ্টি দেখে অভিভূত হয়েছিলেম। ছি ছি, এ আমি কী ভাবছি।

আজ আর কিছুতেই তোমার নিষ্কৃতি নেই রাজকুমার, আজ আর আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না।

সেই নারী আমার কাছে এসে আমার চোখ মুখের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন। তারপরেই চমকে উঠলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে।

আপনি!

আমাকে চেন তুমি?

চিনি বৈকি গুরুদেব, রাজকন্যার আচার্য আপনি।

আমি আশ্চর্য হলেম, বিজয়নগরে কি সবাই সবাইকে চেনে!

চিনতে পেরেছি বলে আশ্চর্য হচ্ছেন, না?

কন্যার দুচোখ হঠাৎ কৌতুকে নেচে উঠল।

আমি তাঁর আপাদ মস্তক একবার দেখে নিলেম, কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে স্মরণ হল না।

আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি, কাল রাতে আপনাকে প্রথম দেখলেম। অন্ধকার রাজপথ থেকে আপনার বন্ধুকে আপনি তুলে নিয়ে গেলেন।

আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

কেন দেব না!

বললেম: তুমি শত্রুপক্ষের মেয়ে। ভাস্করকে তুমি কেন সাহায্য করতে চেয়েছিলে?

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন সেই কন্যা। তারপর উত্তর দিলেন: আমার পরিচয় আপনার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাক না গুরুদেব। একটি রাত্রির জন্য নাই বা সেকথা শুনলেন।

একটি রাত্রি!

আমি উদ্বিগ্ন হলেম।

শুধু একটি রাত্রিরই তো ব্যবধান। কাল কী হবে, সে তো শুধু অন্তর্যামীই জানেন!

আরও কিছু শোনবার জন্য আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম।

কন্যা বললেন: যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ আজ ভাল নয়। বৈশ্যরা ইতিমধ্যেই নগর পরিত্যাগ করতে শুরু করেছেন।

ভাবনার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরতো পেলেম না। আমি সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেম।

নত শিরে ইতস্তত করলেন কন্যা। তারপর সত্য কথা স্বীকার করলেন। বললেন: নিজের স্বার্থে গুরুদেব, আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

আমি এই স্বার্থের কথা জানিনে। কাজেই আরও কিছু শোনবার জন্য উদগ্রীব হলেম।

বাকিটুকুও তিনি বললেন: আমি নগরকন্যা চন্দ্রাবলী। ভালবেসে পাপ করেছি। রাজনৈতিক বাধা যে মিলনের অন্তরায় হবে, তা জানতেম না।

তবু সব কিছু স্পষ্ট হল না।

চন্দ্রাবলী বললেন: রাজকন্যা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি নিজের স্বার্থে আজ তাঁকে সাহায্য করছি। সাহায্যই তো, তাঁর মনোভাব আমি জানি।

বুঝেছি।

বুদ্ধিমতী চন্দ্রাবলী তাঁর মাথা নত করলেন।

অনেকক্ষণ পর তিনি কথা কইলেন, বললেন: আপনি আমার অন্য পরিচয় পেয়েছেন, তাই না?

সত্য কথা আমার মুখে এল না। বললেম: তোমার আরও কোন পরিচয় আছে?

আছে বৈকি গুরুদেব। নিঃস্বার্থ মানুষই কেবল সত্যের মর্যাদা দিতে পারে, ছলনার আশ্রয় দরকার সার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। আজ লোকে আমার যে রূপ দেখছে, সে আমার বাহিরের রূপ। কিন্তু সেকথা আজ থাক। বিজয়নগর রক্ষা পেলে আর এক দিন সে আলোচনা হবে।

আমি ভাস্করের কথা ভাবছিলেম। আমাকে অন্যমনস্ক লক্ষ্য করে চন্দ্রাবলী আমাকে এই প্রশ্নই করলেন: রাজকুমারের সব মঙ্গল তো?

বললেম: জানিনে।

সরস্বতীর সঙ্গে কি তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি?

তাও জানিনে।

চন্দ্রাবলী সন্দেহ প্রকাশ করলেন, বললেন: আমার পত্র কি তাঁদের হাতে পৌঁছয় নি?

বললেম: ভাস্কর সে পত্র পেয়েছেন নগরপালের সতর্ক বাণী

নিয়ে। কাজেই সরস্বতী যে সংবাদ পাবেন না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

তবে আপনি কেন এ ছলনার আশ্রয় নিলেন ?

তারও প্রয়োজন ছিল।

দেখতে পেলেম, বাকি সংবাদটুকুর জন্য চন্দ্রাবলী আমার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এর বেশি বলার সাহস আমার হল না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন: আমাকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না গুরুদেব ?

বড় কঠিন প্রশ্ন। এত অল্পক্ষণের পরিচয়ে মানুষের কতটুকুই বা জানা যায়! তবু তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি। বললেম: সাক্ষাৎ তাঁদের হয়েছে, এই আশাই আমি করছি।

এর বেশি আমিও জানতে চাইনে।

চন্দ্রাবলীর চোখে মুখে খুশী উপচে উঠল। দুহাত জুড়ে নমস্কার করলেন তাঁর দেবতাকে।

তারপর আমার জন্য চিন্তিত হলেন, বললেন: এবারে আপনাকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করি। নগরপালের আগমনের সময় হয়েছে, তিনি এ সংবাদ পেলে কারও পরিত্রাণ নেই।

হঠাৎ খুশী হয়ে বললেন: আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলেম।

চন্দ্রাবলী খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন: আচ্ছা, এইখানেই থাকুন আপনি। বাহির থেকে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে আবার তিনি ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন: একটা অনুরোধ আছে গুরুদেব।

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলেম: বল।

চন্দ্রাবলী ইতস্তত: করে বললেন : আপনাকে রক্ষার জন্য হয়তো আজ অপরিসীম ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

বাধা দিয়ে আমি বললেম : তার তো প্রয়োজন নেই কন্যা। আমার ভাগ্যকে আমি সহজ ভাবেই মেনে নিতে পারব।

চন্দ্রাবলী হেসে বললেন : কিন্তু তাতে যে আপনার বন্ধুর জীবন বিড়ম্বিত হবে। সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তো রাজকন্যার উদ্ধার হবে না। বরং সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁর উদ্ধারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

সত্যি কথা। কিন্তু আমি নগরপালের কর্তব্য বোধের কথা ভেবে আশ্চর্য হলেম। বিস্ময় প্রকাশ করলেম তাঁর কাছে।

চন্দ্রাবলী হাসলেন, বললেন : সেও স্বার্থে।

এর বেশি বলতে তাঁর লজ্জাবোধ হল। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালেম কৃতজ্ঞ চিত্তে।

চন্দ্রাবলী বিদায় নিলেন। তার অল্পক্ষণ পরেই দ্বারে শৃঙ্খল পড়বার শব্দ পেলেম। বন্দী দশায় আমাকে রাত কাটাতে হবে।

॥ সাতাশ ॥

রাত্রি জেগে চন্দ্রাবলীর অভিনয় আমি শুনলেম। অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর মতো নিখুঁৎ অভিনয়। নগরপাল বিহ্বল হলেন। এমন রাত্রি বুঝি তাঁর জীবনে এই প্রথম এল। চন্দ্রাবলী বললেন: তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে।

তোমাকে অদেয় আর আমার কিছুই নেই চন্দ্রাবলী।

নগরপাল উত্তর দিলেন গভীর স্বরে।

চন্দ্রাবলী বললেন: রাজকুমারকে মুক্তি দেব।

আবার মুক্তি!

নগরপাল বুঝি ধৈর্য্য হারালেন।

কিন্তু চন্দ্রাবলীর কণ্ঠস্বর শান্ত। বললেন: তুমি কথা দিয়েছ।

নগরপাল কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু মনে হল, চন্দ্রাবলীর প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেছেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দ্বার শৃঙ্খলমুক্ত করে চন্দ্রাবলী আমার ঘরে এলেন। অন্য একটি দ্বারোন্মোচন করে আমার প্রস্থানের নির্দেশ দিলেন নিঃশব্দে। কোন কথা কইলেন না। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলেম, নিজে নত হয়ে শুধু খানিকটা পদধূলী গ্রহণ করলেন। আমি প্রাণ ভরে তাঁকে আশীর্বাদ করলেম মনে মনে।

সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই। কিন্তু ঘন কালো মেঘে সারা আকাশ তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কোনদিক থেকে আলোর সংকেত আসছে না।

বেশি দূর অগ্রসর হই নি। দেখলেম, চন্দ্রাবলীর গৃহের দিকে অশ্বারোহণে কে ছুটে গেল। ঘোড়ার খুরের শব্দে উচ্চকিত হল প্রত্যুষের বাতাস। সে কি তালিকোটের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে! কিন্তু জয়ের উল্লাস নেই তো তার চলার চালে!

শিরশির করে শীতের বাতাস বইছে অল্প অল্প। ভাস্করের কথা মনে হল। তিনি হয়তো আমার আশ্রমেই অপেক্ষা করে আছেন।

কিন্তু সেখানে তাঁকে পেলেম না।

কোথায় গেলেন ভাস্কর! সারারাত পথে পথে আমার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন না তো! না তিনি নিজেও কোথাও বন্দী হয়ে পড়ে আছেন!

আবার আমি ফিরে চললেম। কিন্তু আজ কোথায় তাঁর খোঁজ করব! অন্ধকারের সঙ্গে আজ আতঙ্ক মিশে আছে। কেমন একটা থমথমে ভাব দেখছি রাজপথে। একটা অস্বস্তি বুঝি চারিদিক থেকে চেপে ধরেছে। নগরের মানুষগুলো আজ কোন দুর্যোগের ভয়ে এখনও ঘুমিয়ে আছে!

পিছনে হঠাৎ ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে দাঁড়িয়ে গেলেম। পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে যিনি থেমে পড়লেন, তিনিই ভাস্কর। দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত তাঁর দুচোখের দৃষ্টি, নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। বললেন: মাধব, সারারাত্রি আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি কিছু বলবার আগেই তাঁর ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, বললেন: উঠে এস।

সেকি!

আমি আশ্চর্য হলেম।

তাড়া দিয়ে ভাস্কর আমায় বললেন: নষ্ট করবার মতো আর আমাদের সময় নেই। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ততক্ষণে তিনি আমাকে তাঁর ঘোড়ার পিঠে টেনে তুলেছেন। বললেন: সন্দেহের আর অবকাশ নেই মাধব। রাজপথে কাল আমি

কানাঘুষো শুনেছি সকলের কাছে, ধনী নাগরিকদের রাতেই পালাতে দেখেছি। কিন্তু আমি তখনও বিশ্বাস করি নি।

ভাস্কর তাঁর ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন মতঙ্গ পর্বতের দিকে। বললেন: আজ বিশ্বাস করেছি। রাজার দূত আজ দুঃসংবাদ এনেছে। নগরপাল তাঁর গৃহে ছিলেন না। রাজদূত যখন এক নগরকন্যার গৃহে তাঁকে এই সংবাদ দিচ্ছিল, নেপথ্যে থেকে আমি তা শুনতে পেয়েছি।

আমরা হেরে গেলেম?

আমি প্রশ্ন করলেম ভাস্করকে।

হ্যাঁ মাধব, আমরা হেরেই গেলেম।

তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি হেরে যাবার গল্প বললেন আমাকে। সংক্ষেপে। যতটুকু না বললে নয়, ঠিক তত কটি কথায়: রণক্ষেত্রের মাঝখানে মখমলের চন্দ্রাতপের নিচে সিংহাসনে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন বৃদ্ধ রামরাজা। আর তাঁর সৈন্যদের প্রলুব্ধ করবার জন্য নানা রত্নাভরণ নিকটে স্তূপাকার করেছিলেন। বাম ভাগে ভেঙ্কটাদ্রির চাপ সুলতানেরা সইতে পারছিলেন না। এমনি সময় মধ্যভাগের ব্যূহ ভেদ করলেন হুসেন নিজাম। রামরাজা তাঁর শিবিকায় আরোহণ করেছিলেন, কিন্তু মত্ত হস্তীর অক্রমণে বাহকরা সেই শিবিকা ফেলে পলায়ন করে। রামরাজা ধৃত ও নিহত হলেন। শূলাগ্রে তাঁর ছিন্নমুণ্ড দেখে আমাদের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন শুরু করেছে।

ব্যাকুল ভাবে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলেম: ভেঙ্কটাদ্রির এই পলায়ন রোধ করতে পারলেন না?

ভাস্কর বললেন: পলায়নের উপলক্ষ খোঁজে যে সেনাদল, তাদের তো ধরে রাখা যায় না।

তবে?

এ প্রশ্নের উত্তর ভাস্কর দিলেন না।

মতঙ্গ পর্বতের পাদদেশে আমায় নামিয়ে দিয়ে বললেন: কথা বলবার আর বোধহয় সময় হবে না মাধব। শত্রুসেনা ছুটে আসছে বিজয়নগর ধ্বংস করতে। এতক্ষণে হয়তো তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে পৌঁছে গেছে।

কথাগুলো ভাস্কর বড় তাড়াতাড়ি বললেন। দূরে দীন দীন রবের প্রতিধ্বনি উঠল প্রত্যুষের বাতাসে।

আমি কিছু প্রশ্ন করবার চেষ্টা করছিলেম, বাধা দিয়ে ভাস্কর বললেন: আমার আর মুহূর্ত বিলম্ব করবার উপায় নেই। নগরবাসীকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করার অনুরোধ জানিয়ে এসেছি। তুমি এই পর্বতের উপর পরশুরামের মন্দিরেই আশ্রয় নাও। আমার অনেক কাজ। রাজকন্যাকে রক্ষা করব, কাল এই অঙ্গীকার করেছি সরস্বতীর কাছে। ঘোড়া পেয়েছি। সেই দূতেরই ঘোড়া। এখন কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন। বিনা যুদ্ধে রাজকন্যাকে প্রাসাদের বাহিরে আনা যাবে না।

জয়স্তু বলে আমি তাঁকে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিলেম। ভাস্কর হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন: যদি পার, সরস্বতীকে দেখো। নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা সে করবে না।

বললেম: সেকি?

ভাস্কর বললেন: সত্যিই তাই। বললে, রাজকন্যার বেশে শত্রুর অপেক্ষা করে সে থাকবে। রাজকন্যা পালিয়েছেন জানলে কেউ আর নিস্তার পাবে না। কিন্তু তার নিজের কী হবে, আমি জানতে চেয়েছিলেম। তার কাছে নাকি নির্বাণের মন্ত্র আছে, সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, মৃত্যু তাকে তার দুর্গতি থেকে রক্ষা করবে!

বলেই রুদ্ধশ্বাসে ভাস্কর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সূর্যকিরণে পৃথিবী আজ ঝলমল করে উঠল না। গভীর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল বিজয়নগরের আকাশ।

ভাস্করের নির্দেশ মতো পর্বতের উপর পরশুরামের মন্দিরে যখন পৌঁছলেম, নিঃশ্বাসে তখন টান ধরেছে। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে গেছে সারা শরীর।

মন্দির প্রাঙ্গণ আজ জনশূন্য। চারিদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে পেলেম না। চাতালের উপর বসে পড়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলেম।

আচার্য দেব, আপনি এখানে!

চকিতে চেয়ে দেখি, সুদর্শন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। আমি মুখ তুলতেই আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল।

জিজ্ঞাসা করলেম: মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা সব কোথায় সুদর্শন?

কোমল কণ্ঠে সুদর্শন বলল: কেউতো আর নেই আচার্য দেব!

কেউ নেই এখানে?

আমি আশ্চর্য হলেম।

সুদর্শন বলল: রাতের অন্ধকারে সবাই প্রস্থান করেছেন। বলে গেছেন, বিজয়নগরের সুদিন যদি ফিরে আসে, তাঁরাও আবার ফিরে আসবেন।

তুমি রয়ে গেলে?

সুদর্শনের দৃষ্টি হঠাৎ সিক্ত হল। বলল: গুরুদেবের কাছে এই শাস্তি আমি চেয়ে নিলেম। আমার কৌতূহলের জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি আমাকে রাজার চর ভাবতেন। মনে মনে ঘৃণাও হয়তো করতেন। আমি তাই তাঁকে নিশ্চিন্ত মনে যেতে দিলেম, পরশুরামের পূজার দায়ীত্ব নিলেম স্বেচ্ছায়।

আমি মুগ্ধ হলেম। বললেম: নিজের বিপদের কথা তুমি একবারও ভাবলে না সুদর্শন?

সুদর্শন হেসে উত্তর দিল: বিপদ! গুরুদেবের সন্দেহের মতো সে অত গভীর পীড়াদায়ক হবে না। তা ছাড়া যে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ

একুশবার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন, তিনি তাঁর একটি সেবককে কি রক্ষা করতে পারবেন না ?

তার হাসি দেখলুম কান্নার মতো করুণ।

দুচোখ আমার জলে ভরে এল।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল তুঙ্গভদ্রার পারঘাটের উপর। অসংখ্য অশ্বারোহী পিপীলিকার শ্রেণীর মতো এগিয়ে আসছে। অস্পষ্ট কোলাহল উঠেছে চারিধার থেকে।

সুদর্শন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মাল্যবান গিরির দিকে। সেও এক অভাবনীয় দৃশ্য। কাতারে কাতারে নরনারী সেই পথে ছুটছে। বৃদ্ধ ও শিশু ছুটছে শুধু হাতে, সন্তান বুকে নিয়ে ছুটছে স্নেহময়ী জননী, আর সমর্থ পুরুষ পিঠে বোঝা বেঁধে ছুটছে। আরও দূরে পথের ধূলায় দিগন্ত আচ্ছন্ন করে ছুটে চলেছে অশ্বারোহী নাগরিক। তার পিছনে শিবিকা নিয়ে ছুটে যাচ্ছে পুরস্কার লোভী বারবরদারের দল।

কোলাহল স্পষ্ট হল। উন্মত্ত উল্লাসের সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি প্রাণান্ত আর্তনাদ। মনে হল, তাণ্ডব শুরু হয়েছে আজ পর্বতের চারিধার ঘিরে, পথে পথে, হর্ম্যে ও প্রাসাদে, বিপণী ও দেবমন্দিরে।

হঠাৎ এক ব্রাহ্মণকে দেখলেম গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছেন পর্বতের আড়ালে আড়ালে। কী একটা ভারি জিনস তাঁর:উত্তরীয়ের নিচে। সমস্ত দৃষ্টি সংহত করে তাঁকে চেনবার চেষ্টা করলেম। এই কি সেই ব্রাহ্মণ, যাঁকে বিঠল স্বামীর মন্দিরে সন্ধ্যারতি করতে দেখেছি অনেকবার।

সুদর্শন আমার সন্দেহকে সমর্থন করল। বলল : সেই ব্রাহ্মণই বটে।

তবে কি ইনি বিঠল স্বামীর বিগ্রহকেই আজ—

আর ভাবতে পারলেম না। অবসন্ন হয়ে আসছে সারা শরীর। দুহাতে মুখ ঢেকে মাটির উপরেই বসে পড়লেম।

সুদর্শন দাঁড়িয়ে ছিল। বলল: আচার্যদেব, দুরন্ত সংঘর্ষ বেধেছে প্রাসাদের সিংহদ্বারে। মরণ পণ করে লড়ছেন নির্ভীকচেতা নগরপাল।

কামানের গর্জন হঠাৎ স্তব্ধ হল। আর্তনাদ করে উঠল সুদর্শন।

আমিও আর্তনাদ করে উঠলেম: কী হল ব্রাহ্মণ?

সব শেষ হয়ে গেল: সুদর্শন জবাব দিল আর্তস্বরে: শত্রু সেনা আমাদের কামান দখল করেছে। নগরপালকে আর দেখতে পাচ্ছিনে। কিন্তু কে উনি? অশ্বারোহণে যেন এক ব্রাহ্মণকে দেখতে পাচ্ছি!

ব্রাহ্মণ।

আমি লাফিয়ে উঠলেম। ঝঞ্ঝার মতো ছুটে এসে অসি চালনায় শত্রুমুক্ত করলেন সিংহদ্বারের কামান দুটো। তারপরেই অগ্নি বর্ষণ সুরু হল ভীম গর্জনে।

এমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখি নি। এমন দৃশ্য দেখতে হবে, তাও ভাবি নি স্বপ্নে। মৃত্যুর মতো তীব্র একটা বেদনা বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। চোখ বুঁজে আবার আমি বসে পড়লেম।

কামানের গর্জন তখন স্তব্ধ হয়েছে। ভাবলেম, যুদ্ধেরও বুঝি অবসান হল।

কী হল সুদর্শন?

সুদর্শন বুঝি হতবাক হয়ে গেছে। বলল: সেই অশ্বারোহী ব্রাহ্মণকে তো আর দেখতে পাচ্ছিনে আচার্যদেব।

ব্রাহ্মণ নেই?

লাফিয়ে উঠে আমি আমার সমস্ত দৃষ্টি চারিদিকে সঞ্চারিত করে দিলেম। যুদ্ধের অবসান হয়েছে সত্য। কিন্তু ধ্বংসের লীলা তখন

শেষ হয় নি। যবন সেনা কামান দুটি অধিকার করে তার মুখ ঘুরিয়েছে প্রাসাদের দিকে। দেখতে দেখতেই আবার অনল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। এবারে আর মানুষ মরছে না। গোলার আঘাতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে মর্মরের প্রাচীর। ভাস্কর নেই। চোখে আমি অন্ধকার দেখলেম।

আচার্য দেব!

সুদর্শনের চীৎকারে আমি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেম। সেই সঙ্গেই এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলেম প্রাসাদের দক্ষিণ সিংহদ্বারে। সেই অশ্বারোহী ব্রাহ্মণ বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে এলেন শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে। আর মুহূর্ত মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অসহ্য কোলাহল উঠেছিল যবন কণ্ঠে, তীরে আর ভল্লে ছেয়ে গিয়েছিল নিচের আকাশটা!

আজ সূর্য ওঠে নি। মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে সকালের সুন্দর আকাশ। বাতাস দুরন্ত হয়ে উঠেছে আশ্রমের আম্রকাননে।

খানিকক্ষণ পরেই সেই ব্রাহ্মণকে দেখলেম মাল্যবান গিরির পথে ঘোড়ার খুরে খুরে পথের ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে বুকের ভিতর মিলিয়ে আছেন এক মূর্ছিতা কন্যা। মনে হল, ভাস্কর দেব তাঁর সঙ্কল্প রক্ষা করেছেন। রাজ্যহীন রাজপুত্র পেয়েছেন রাজ্যহীন রাজকন্যা।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে আজ আশাবরীর আলাপ হল না। বিজয়নগরের আকাশে নামল যুগান্তের অশান্ত বর্ষণ।